নতুন চিঠি

অশোক ব্যানার্জী

স্মরণ সংখ্যা

জন্ম : ৬ মার্চ, ১৯৩৮
মৃত্যু : ২৯ মার্চ, ২০২০

সম্পাদক
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক : দিনেশ ঝা

সম্পাদনা সহযোগ : অরুণ মজুমদার, সুকৃতি ঘোষাল
শিবানন্দ পাল, কাজী আবদুল করিম,
কিশোর মাকর, মুরারি মণ্ডল
পার্থ চৌধুরী, ফজলুল বারি মিদ্দা

প্রথম প্রকাশ : ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা: আবদুস সবুর

অক্ষরবিন্যাস : সনাতন বেরা

প্রুফ রিডিং : বিনয় চন্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আবদুল্লা মিদ্দা

মুদ্রক : নতুন চিঠি প্রেস
৬২, বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন,
বর্ধমান-৭১৩১০১

মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস
১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৭১৩১০৪

মূল্য : ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২, বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
কোলকাতা, সল্টলেক, বর্ধমান ও দুর্গাপুর

ছবিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও নতুন চিঠি পত্রিকার অ্যালবাম থেকে।

মুখবন্ধ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল চেতনা ও কর্মের সংশ্লেষে গড়ে ওঠা এক পরিপূর্ণ মানুষ। জীবন-সংগ্রামে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সমাজবদলের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের একনিষ্ঠ সৈনিক 'নতুন চিঠি' সেই সংগ্রামেরই কণ্ঠস্বর হয়ে উঠুক, এই আন্তরিক তাগিদেই তিনি হয়ে ওঠেন এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সহযোগী সাংবাদিক ও পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'নতুন চিঠি পরিবার'। যে পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমরা গর্বিত। বহুমুখী কর্মধারায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ভাবে জড়িত হয়ে পড়ার কারণে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা একটুও কমেনি। সুযোগ পেলেই পত্রিকা দপ্তরে ছুটে আসতেন এবং যথেষ্ট সময় দিতেন। এরকম একজন অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি।

'নতুন চিঠি' পত্রিকার প্রাণপুরুষ হিসাবে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনন্য ভূমিকা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মধারার একটি দিক মাত্র। বৃহত্তর ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং বিভিন্ন সম্মানজনক পদে আসীন হয়েছেন। বিশিষ্ট সমবায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন 'সমবায়রত্ন' নামক সর্বভারতীয় সম্মাননার অধিকারী এবং 'সমবায় ও মানবসভ্যতা' নামক অমূল্য গ্রন্থের প্রণেতা। সমবায়ের মধ্যে সমবায় হিসাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টায় সারা দেশ এবং বিদেশও তিনি ছুটে বেরিয়েছেন। নারী-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও বঞ্চিত নর-নারীর জীবনে অন্তত দু-বেলা দু-মুঠো আহার যোগানোর দায়িত্ববোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন মহাজনী শোষণে নিষ্পিষ্ট কৃষক সহ সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থরক্ষার জন্য, খেতমজুরের যথাযোগ্য মজুরির জন্য, বড় জমির মালিকের হাত থেকে বে-আইনি জমি পুনরুদ্ধার করে গরিব কৃষকের হাতে তুলে দেবার জন্য। সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছেন মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের নানান দাবি-দাওয়ার লড়াইও। তীব্র ডায়াবেটিস সহ নানাবিধ শারীরিক

অসুস্থতাও সত্ত্বেও তিনি ঘরে বসে থাকেননি, যথাসাধ্য শারীরিক সতর্কতা অবলম্বন করে বিভিন্ন কর্মধারায় তাঁর দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেছেন। এই লড়াই-সংগ্রামের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে হবে আমাদেরও।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুমুখী কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত এবং বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বিশিষ্টজনদের স্মৃতিচারণা, বিশেষত তাঁর জীবনসঙ্গিনী গৌরী ব্যানার্জীর সঙ্গে একটি অমূল্য সাক্ষাৎকারে সমৃদ্ধ এই সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

সমবায় আন্দোলনের দিশারী কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	বিমান বসু	৭
আদর্শে অবিচল থেকেই তিনি নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন	মদন ঘোষ	৯
এক আপনজনের কাহিনি	অরিন্দম কোঙার	১৫
আমাদের উজ্জীবিত করার জন্য অশোকদা আর নেই	অমল হালদার	২১
কমরেড অশোক ব্যানার্জী—প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	অচিন্ত্য মল্লিক	২৫
অশোক জেঠুকে যেমন দেখেছি	আভাস রায়চৌধুরী	২৮
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ও সহযোদ্ধা গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার	রামপ্রণয় গাঙ্গুলী	৩১
স্মৃতির দর্পণে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	৩৯
‘হে সখা মম হৃদয়ে রহ’	মৃদুল সেন	৪৩
কমরেড অশোক ব্যানার্জী—কমিউনিস্ট মূল্যবোধে লালিত এক সংগ্রামী জীবন	সেখ সাইদুল হক	৫০
স্মৃতিতে অশোকদা	অনিল মাইতি	৫৬
অশোকদাকে মনে রেখে	জহর মুখোপাধ্যায়	৬১
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়—একান্ত ব্যক্তিগত	জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী	৬৪
প্রশাসক ও ব্যাঙ্কার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় : এক আলোকবর্তিকা	বিশ্বজিৎ মাইতি	৬৯
স্মৃতির সরণী বেয়ে : শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে	রাজীব চট্টোপাধ্যায়	৭৬
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	কাকলী গায়েন	৮০
কর্মাশোক	দেবেশ ঠাকুর	৮২
এক হার না-মানা মানুষের কথা	গীষ্পতি চক্রবর্তী	৮৫
সাধারণ বেশভূষায় এক অসাধারণ কর্মোদ্যোগী	নন্দনকুমার বসু	৮৯

স্বপ্নোজ্জ্বল দিনের এক সেনানী	অরুণ মজুমদার	৯২
সেই আহ্বান ভোলা যাবে না	শিবানন্দ পাল	৯৫
অশোকদাকে যেমন দেখেছি	দিনেশ ঝা	৯৮
অপ্রকাশিত প্রকাশক	পার্থ চৌধুরী	১০২
প্রেষণাই ছিল অশোকবাবুর প্রাণশক্তি	শ্যামসুন্দর বেরা	১০৭
এক আলোর মানুষ অশোকদা	মলয় রায়	১১২
নতুন চিঠি-র অভিভাবক অশোকদা অমর রহে	কিশোর মাকর	১১৪
এক প্রবীণের যুবমনের সান্নিধ্য	মুরারী মণ্ডল	১১৬
কিছু স্মৃতি—কিছু কথা	আব্দুস সবুর	১১৮
কমিউনিস্ট অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	কাজী আবদুল করিম	১২১

সমবায় আন্দোলনের দিশারী কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমান বসু

কমরেড অশোক ব্যানার্জী আমাদের দেশের বর্তমান করোনা অতিমারী শুরু হওয়ার প্রথম পর্বেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অবশ্যই তাঁর করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়নি। ১৯৩৮ সালের ৬ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এবছরের ২৯ মার্চ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। অনেকেই মনে করেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হলেই সে কমিউনিস্ট হয়। কেউ কখনো কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে না। কমিউনিস্ট হয়ে ওঠার জন্য নিজের সঙ্গে নিজেকে লড়াই করতে হয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা এবং তদনুযায়ী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত পরিচালনা করায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শরীরে নানা ধরনের সমস্যা থাকলেও শারীরিক সমস্যা তাঁকে মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করা থেকে কখনো বিরত করতে পারেনি। আমার সঙ্গে অশোকবাবুর পরিচয় অনেক পরে—যখন তিনি বর্ধমান জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও কাজে যুক্ত হতে শুরু করলেন, সেই সময়ে।

১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বর্ধমান থেকে প্রথম 'নতুন চিঠি'র প্রকাশ হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পত্রিকা

প্রকাশের পর তাঁকে নানা বিষয়ে লিখতে হতো এবং মন্তব্য করতে হতো। এই কার্যধারার মধ্য দিয়ে তিনি সাংবাদিক হয়ে ওঠেন। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে তিনি কেমন পার্টিনেতা ছিলেন বা কেমন সাংবাদিক ছিলেন এই এটা ছোট্ট লেখার আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি ছিলেন আমাদের রাজ্য ও দেশের একজন সফল সমবায়ী। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের গ্রামবাংলার জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে সমবায় ব্যবস্থাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং সাধারণ কৃষক ও সমাজের বঞ্চিত অংশের স্বার্থে সমবায় আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। এককথায় বলা চলে, সমবায় ব্যবস্থা বা কো-অপারেটিভ সিস্টেমকে শ্রেণিশোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় তিনি ব্যয় করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের স্বার্থে সমবায়ের আন্দোলন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি রাজ্যভিত্তিক সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কর্মকর্তার পদে ছিলেন। ক্রমশ তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমবায় আন্দোলনের দিশারী। অন্যদিকে, সমবায় আইন কানুন পরিবর্তনের কাজে তিনি নিয়মিত কলম ধরেছিলেন। সমবায় ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সমবায় ও কৃষি সম্পর্কিত দুটি পুস্তক লিখেছিলেন। সবথেকে বড় জিনিস তিনি মানবসভ্যতার ইতিহাসে সমবায়ের ভূমিকাকে তুলে ধরতে দেশ-বিদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একটি অমূল্য গ্রন্থ—'সমবায় ও মানব সভ্যতা' নামকরণে পাঁচশো পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ পুস্তক—রচনা করেছিলেন। যা আমার বিচারে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ।

আমাদের রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ নারী সমাজের কাছে 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' বা 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী' গড়ে তোলার যে অভিযান শুরু হয়েছিল সেক্ষেত্রেও তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। যেমন ছিল সমবায় ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট সোসাইটির নিয়মকানুন সরলীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা। আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতায় দেখেছি দুইটি বড় বড় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সব সদস্যদের নিয়ে পুরুলিয়া জেলার একটি প্রান্ত এলাকায় একবার একটি সাধারণ সভায় বলার জন্য উদ্যোক্তারা বামফ্রন্ট সভাপতি হিসাবে নিয়ে গেলে আমার বক্তব্যের পর অনেকেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, "আমরা কি একটু সমবায় আন্দোলনের নেতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি না?" আমি বলেছিলাম, "নিশ্চয়ই পারেন, আপনারা চিঠি লিখুন। আমিও অশোকবাবুকে বলবো।"

আমরা সকলেই জানি মানুষের জীবন একটিই। কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আট দশকের জীবন সৎভাবে সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ থেকে মানুষের স্বার্থে সমাজের অবহেলিত জনগণের স্বার্থে ব্যয় করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন।

কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় লাল সেলাম।

লেখক : *সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান।*

আদর্শে অবিচল থেকেই তিনি নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন

মদন ঘোষ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ মার্চ ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ মার্চ ২০২০ সালে প্রয়াত হন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রাম শ্রীধরপুরে হয়। তারপর ভাতাড় এম.পি. ইন্সটিটিউশন থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু হঠাৎ বাবার অসুস্থতার কারণে অনার্স পড়া আর সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কাজে যোগ দিতে হয়। পরে প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেন।

চাকুরিজীবন :

চাকুরিজীবনের শুরু বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরি ব্লক অফিসে ক্যাশিয়ার হিসেবে। পরে বদলি হয়ে মেমারিতে আসেন। তখন মেমারি একটিই ব্লক ছিল। বি.এ পাশ

করার পর বর্ধমান শহরের সন্নিকটে রায়ান স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন এবং সেখান থেকেই 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিতি লাভ করেন। এর পূর্বে দুর্গাপুরে একটি কারখানায় কাজ করেন। ১৯৬৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজে যুক্ত হন।

বিবাহিত জীবন :

কর্মসূত্রে মেমারিতে বসবাসের সময় পাশাপাশি বাস করতেন অশোকদা ও গৌরী ব্যানার্জীর পরিবার। ওখানেই গৌরী ব্যানার্জী একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। দুই পরিবারের আলোচনাসূত্রেই তাঁদের বিবাহ স্থির হয়। পরে গৌরী ব্যানার্জীও প্রাইভেটে বি.এ পাশ করেন ও গলসী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যুক্ত হন।

গণআন্দোলনে অশোকদা :

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসানের পর রায়ান- মির্জাপুর-পালিতপুর এলাকার জমিদার-জোতদারেরা গরিব মানুষের দখলীকৃত জমি ছিনিয়ে নেওয়ার আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এর বিপরীতে গরিবরাও দখলীকৃত জমির অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়। গরিবদের উচ্ছেদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন অশোকদা। এই আন্দোলন চলাকালীন জমিদার-জোতদার আশ্রিত গুণ্ডা ও পুলিশ যৌথভাবে মাঠে নামে এবং অশোকদাকে ধরে নির্বিচারে লাঠিপেটা করে। এই আক্রমণে অশোকদার শরীর কার্যত মাংসপিণ্ডের রূপ নেয়। তৎকালীন রাজ্য সরকারের পুলিশ শুধু তাঁকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বর্ধমান শহরের অন্যতম কুখ্যাত গুণ্ডা গুণমণি রায় হত্যা মামলাতেও যুক্ত করে। এই মামলা থেকে অশোকদা ১৯৭৩ সালে বেকসুর খালাস পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় জি.টি রোডের কেশবগঞ্জ চটিতে পুলিশফাঁড়ির প্রায় বিপরীতেই অশোকদার জন্য একটি কোয়ার্টার বরাদ্দ হয়েছিল। অশোকদা জেলে থাকাকালীন কোয়ার্টার আবাসনটিতে শুধুমাত্র গৌরী ব্যানার্জী ও তাঁর মেয়ে অন্বেষা (তোতা)-ই বসবাস করতেন তাই নয়, তাঁর সঙ্গে থাকতেন ওঁর মামিমা ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা। ওই বাসাতেই মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতাম নিরুপম সেন ও আমি।

ঘটনাচক্রে ওই পরিবারের আর একজন সদস্য হয়ে উঠেছিলেন কমল গায়েন। বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুবী গ্রামের এক অভাবী পরিবারে কমল গায়েন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কিত এক দাদার কেশবগঞ্জ চটিতে একটি গ্রিল তৈরির কারখানা ছিল। কমল গায়েন ওখানে এসেই হাতুড়ি পেটানো কাজে যুক্ত হন। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কমল গায়েন সিপিআই(এম) পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন ও সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। তিনিও অশোকদার পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেন।

এই ষাটের দশকের শেষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয় এবং তার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন জেলা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সুবোধ চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে পার্টিতে ছিলেন মৃদুল সেন, অমল ব্যানার্জী এবং এস.এম. আসগর। ওই বছরই পরে যুক্ত হন মধু ব্যানার্জী ও অশোক ব্যানার্জী। কারামুক্তির পর অশোকদা তাঁর সদস্যপদ নিয়ে চলে আসেন শহর-সদর লোকাল কমিটির নিয়ন্ত্রণে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন, আমি তখন লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলাম। সাধারণভাবে লোকাল কমিটির আলোচনায় অশোকদার সাথে আমার মতপার্থক্য ঘটতো না। আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আমরা বর্তমানে 'Partial Partisan Warfare'-এর স্তরে আছি এবং সেই অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল। এর মাঝেই ঘোষিত হয় ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হবে কি না তা নিয়ে পার্টিতে মতপার্থক্য ঘটে। একাংশের মত ছিল যে আমাদের দেশে চলতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না। এ নিয়ে রাজ্যস্তর থেকে একেবারে নীচে পর্যন্ত আলোচনার ঝড় ওঠে। এই আলোচনার সূত্র ধরেই আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী থাকায় আমার সাথে অশোকদার মতপার্থক্য হয়েছিল। এটাই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা। ১৯৮১ সালে কাটোয়ায় অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলন থেকে অশোকদা জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০১১ সালে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর পার্টির জেলা কমিটি জেলা পার্টির মুখপত্র হিসেবে অতীতে 'নতুন পত্রিকা'র বদলে 'নতুন চিঠি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই বছরেই ২৫ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় 'নতুন চিঠি' পত্রিকা। অশোক ব্যানার্জীই ছিলেন নতুন চিঠির মুদ্রক-প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। যতদূর মনে পড়ছে মৃদুল সেন, সুধীর রায়, মৃত্যুঞ্জয় শীল, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন সুর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে অন্য কাজের কারণে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া সকলে সরে যান। আনোয়ারদা, অরুণ মজুমদার, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য যুক্ত হন। নিরুপম ও আমিও যুক্ত ছিলাম। জেলার মূলত বর্ধমান সদর মহকুমা জুড়ে স্থায়ী গ্রাহক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই নতুন চিঠি প্রকাশনার কাজ করতো এবং প্রকাশনা থেকে বিধানসভা লোকসভা এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় 'তথ্য কথা বলে' বলে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হতো। 'তথ্য কথা বলে' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অশোকদা। এছাড়াও এই প্রকাশনা থেকে অনেকগুলি পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল অশোকদার লেখা 'সমবায় ও স্বনির্ভরতা', 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' দুটি পুস্তক। এই প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আমাদের বর্ধমান জেলার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ

শাহেদুল্লাহ (মটরদা) রচিত গ্রন্থ 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'। আরও অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

অশোকদা যখন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি পদে কোলকাতায় চলে যান তার পর থেকে নতুন চিঠির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। অশোকদার অন্যান্য গুণের মধ্যে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য বড় গুণ ছিল তাঁর সংস্কৃতিমনস্কতা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের যে একটি সাংস্কৃতিক শাখা ছিল সেটি পরিচালিত হতো অমল ব্যানার্জী ও মৃদুল সেন-এর দ্বারা। অশোকদা ও গৌরী ব্যানার্জী ওই টিমে অভিনয় করতেন। ওই শাখার অন্যতম প্রযোজনা ছিল 'হারানের নাতজামাই'।

সমবায় আন্দোলনে :

শ্রীধরপুর সমবায় ব্যাঙ্ক থেকেই অশোকদার সমবায় আন্দোলনের হাতেখড়ি। পরে ১৯৮৫ সালে ওখান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮৯ সালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হন। এই সময়েই তিনি ডাব্লু.বি.এস.সি-র ডিরেক্টর ও পরে চেয়ারম্যানও হন। অশোকদা যখন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি, তখন রাজ্য সরকারের আর্থিক অনটনের কালে রাজ্য সরকারকে ঋণ নিতে প্রভূত সাহায্য করেছিল রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। অশোকদা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি থাকাকালীনই পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিত্তনিগম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। চেয়ারম্যান প্রসঙ্গে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনায় প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু এই নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে অশোক ব্যানার্জীর নাম প্রস্তাব করেন। অশোকদাকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় ডেকে পাঠানো হয়। আলোচনার প্রথমে তিনি বাড়তি কাজের বোঝা নিতে অস্বীকার করলেও জ্যোতিবাবু জোর দেওয়ায় তিনি সম্মত হন। কিন্তু তিনি একটি শর্ত যুক্ত করেন। শর্তটি ছিল বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যানের লোক নিয়োগের কোটা সম্পর্কিত। অশোকদা সরাসরি বলেন এই কোটা বিলোপ করলে তিনি এই দায়িত্ব নিতে রাজি। জ্যোতি বসু সহ গোটা সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে ও রাজ্য সরকার সেটা কার্যকর করে।

অশোক ব্যানার্জীর উদ্যোগেই তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পরিচালক মহম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমবায়ের মধ্যে সমবায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের কাজ শুরু করেন। কয়েকটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী বাদে রাজ্যের প্রায় সমস্ত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সমবায় ব্যাঙ্কের আওতায় আসে। এবং সেই সময় মিড-ডে-মিল-এর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের প্রায় দশ লক্ষাধিক দুঃস্থ মহিলা এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তা অশোকদাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা

করেন। সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী পুরস্কারও অর্জন করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। নাবার্ড তাঁকে 'সমবায় রত্ন' সম্মানে ভূষিত করে এবং পুরস্কারের সাথে পাওয়া ৫০ হাজার টাকা তিনি 'সমবায় শিক্ষা ট্রাস্ট' গঠন করে তাতে দান করেন।

২০১১ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর সমবায় আন্দোলনের উপর বড় আঘাত নেমে আসে। সেই আঘাত থেকে সমবায় আন্দোলনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অশোকদা সহ কয়েকজনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ'। এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অশোক মিত্র।

সংকল্প পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :

জেলার কিছু কৃষি-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপাদনব্যয় কমানোর লক্ষ্যে 'সংকল্প পিপলস ডেভলপমেন্ট সোসাইটি' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী এবং রাজ্য কৃষি অধিকর্তা ড. ধবলেশ্বর কোনার, কৃষিবিজ্ঞানী ড. মৃণালকান্তি বসু, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রণব চ্যাটার্জী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। অশোকদা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জৈব ও জীবাণু সার ব্যবহারে কৃষক-সাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলি প্রদর্শনীক্ষেত্র গড়ে ওঠে। মানুষ ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। এরই সাথে যুক্ত এস.আর.আই বা 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো সহায়তা না পাওয়ায় শুরু থেকেই এই প্রয়াস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। এরই সাথে নাবার্ডের সহায়তায় আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বনসৃজন, জল সংরক্ষণের কাজ এবং প্রাণী পালনের কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্প রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্গাপুরের স্বপন মাতা, দেবু বোস, সৈয়দ মহঃ মসীহ-কে অশোকদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল সহায়তা করেন। নাবার্ডের কেন্দ্রীয় টিম এই প্রকল্প পরিদর্শনে এসে তার সামাজিক ও আর্থিক দিকগুলি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে ভূয়সী প্রশংসা করে। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সালানপুরে 'সংকল্প জল বিভাজিকা' ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে বরাকর-১, ২-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বরাকর-৩ প্রকল্প প্রায় শেষের মুখে এবং ৪ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি বারে-বারে সালানপুর ও নাবার্ডের রিজিওনাল অফিসে ছুটে গেছেন। বরাকর প্রকল্প অঞ্চলে পরিবেশ উন্নত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের উন্নতি ঘটেছে, পাখির আনাগোনা বেড়েছে। তাঁর প্রয়াণে এই প্রকল্প রূপায়ণে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

অশোকদা দীর্ঘদিন মধুমেহ (ডায়াবেটিস) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। দু-বেলায় চার বার ইনসুলিন নিতে হতো। কিন্তু খাবারে সংযমের ফলে দীর্ঘদিন তিনি কর্মক্ষম ছিলেন। এই অসুস্থতার মাঝেই তাঁর জীবনে তিনটি বড় আঘাত নেমে আসে। প্রথমটি

তাঁর একমাত্র সন্তান তোতার বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরবর্তীতে তোতার অকালপ্রয়াণ। এবং সর্বশেষে ওই পরিবারের অন্যতম সদস্য কমল গায়েন যিনি প্রদীপ তা'কে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পরপর এই ঘটনাক্রম অশোকদার জীবনকে ভীষণভাবে আঘাত করে। এর সাথেই যুক্ত হয় ভাইপো, পরে ভাইয়ের মৃত্যু। যা পরে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শেষের দিকে অশোকদার অসুস্থতা আরও বাড়ায় তিনি খানিকটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন এবং বাড়ি বিক্রি করে সর্বমঙ্গলা পাড়ায় এক পার্টি পরিবারে ভাড়াটে হিসাবে আসা মনস্থ করেন। সে সময়েও চলাফেরাতে স্বাভাবিক ছন্দে ছিলেন। তাঁর অসুস্থতা বাড়তে থাকে, চলাফেরার স্বাভাবিক ছন্দও হারিয়ে ফেলেন। ফলে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানোও কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর প্রয়াণের কয়েকদিন আগেও (লকডাউন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার) তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। আমার বেদনা এই যে লকডাউনের কারণে তাঁর প্রয়াণের সময় শেষ শ্রদ্ধা জানানো থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলাম।

কমরেড অশোক ব্যানার্জী লাল সেলাম। কমরেড অশোক ব্যানার্জী অমর রহে।

লেখক : *সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রয়াত ব্যানার্জীর পারিবারিক বন্ধু।*

এক আপনজনের কাহিনি

অরিন্দম কোঙার

মর্মান্তিক

তখন নোভেল করনা ভাইরাসের আক্রমণ চলছে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লকডাউন জারি। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা নিষেধ, মানুষের পরস্পর কাছে আসা বন্ধ। সেই পরিস্থিতিতে সদা-ব্যস্ত এক মানুষের জীবনদীপ নিভে যায়। বর্ধমান শহরে ২০২০ সালের ২৯ মার্চ। প্রায় অলক্ষ্যে, প্রায় অজান্তে। অথচ তিনি অনেকেরই আপনজন ছিলেন। অসংখ্য তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীসহ জনা পাঁচেক মানুষ। কী বেদনাদায়ক! কী মর্মান্তিক!

সদা-ব্যস্ত

সদা-ব্যস্ত সেই মানুষটা হচ্ছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে ব্যস্ততা শুরু। তারপর প্রসারিত হতে হতে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে দেশে। ব্যস্ততা সমবায়ের জন্য, ব্যস্ততা কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, ব্যস্ততা কোনো মানুষের চিকিৎসার জন্য, ব্যস্ততা কোনো মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য, ব্যস্ততা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য। চার দশক ডায়াবেটিস রোগ সঙ্গী ছিল, চোখের দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ, শেষের দিকে পারকিনসন রোগ থাবা বসিয়েছিল। কিন্তু কাজের বিরাম নেই। চেনা-অচেনা মানুষের সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারতেন এবং ক্রমে তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যেতেন। ফলে ব্যস্ততা থেকেই যেত। শেষের দিকে বছর দুয়েক একা এখানে-ওখানে যেতে পারতেন না, তবু যেতেন অপরের সাহায্যে।

কর্মজীবন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারা জীবন সংগ্রামী জীবন। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম। পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা অসমাপ্তই থাকে। তবে প্রাইভেটে স্নাতক হন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত হন।

তবে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়ার আগে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত হন সমবায়ী হিসাবে। জীবিকার অন্বেষণে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে কিছু কিছু রোজগার করে শেষ পর্যন্ত বর্ধমান সদর থানার রায়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে ব্রতী হন, 'মাস্টারমশাই' হিসাবে এলাকায় প্রিয় হয়ে ওঠেন। সেখান থেকে চলে আসেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হয়ে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন, চাকরিতে ইস্তফা দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সর্বোচ্চ সংখ্যায় কর্মচারীদের সমর্থন নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রামনারায়ণ গোস্বামী যখন জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আপ্ত-সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষ ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ের আগে ও পরে তাঁর পরিবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তবলা ও বেহালা বাজাতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন। তাঁর স্ত্রীর অভিনয়ে দক্ষতা ছিল, মেয়ে আবৃত্তি করত, অভিনয় করত। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল সেন, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা স্থাপন করেন সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অন্বেষা'। এই সংস্থা শহরে-গ্রামে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'হারানের নাতজামাই' নাটক।

অর্থনীতির বিশ্লায়নের কালে কৃষকের দুরবস্থায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতের উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হল খরচ কমিয়ে এনে জমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন বাড়ানো, চাষের বৈচিত্র্য এনে ও কৃষির নিবিড়তা বাড়িয়ে, কৃষককে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা, কৃষককে নতুন কৃৎকৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কৃষির সঙ্গে কৃষি-সম্পর্কিত পশুপালন, মৎস্য চাষ, বীজ উৎপাদন, জৈব সারের উৎপাদন, শস্য প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রাম্য ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করে প্রতি পরিবারের একজনের কাজের ব্যবস্থা করে কৃষককে স্বনির্ভর করা।" (প্রাক্‌কথন, স্বনির্ভরতার সন্ধানে) এই উপলব্ধি থেকে স্থাপিত হয় 'সংকল্প পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা- সভাপতি।

ঠিক তেমনি 'নতুন চিঠি' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাপ্তাহিকটা পরিচালনায় তিনি শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকেন।

রাজনৈতিক পরিচয়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র-রাজনীতিতে তো যুক্ত ছিলেনই, বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসেন বিশ শতকের ছয়ের দশকে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সংস্পর্শে আসেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র তৎকালীন বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সুবোধ চৌধুরীর। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন এবং ১৯৮১-২০১১ পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন।

কেবল উপরের দিকের কমিটি নয়, শাখাস্তর পর্যন্ত তিনি পার্টিসভায় যেতেন, পাড়া বৈঠক করতেন, নির্বাচনের সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। তাঁর এলাকায় এমন কোনো পার্টিকর্মী ছিলেন না যাঁকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না।

কৃষক ও কৃষিসমস্যা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই বুঝতেন, হাতে-কলমে কৃষক আন্দোলন করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার রাজ্যস্তরের নেতা হয়েছেন।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর প্ররোচনায় পুলিশের হামলায় গুরুতরভাবে জখম হন। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাঁকে মাংসপিণ্ড আকারে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনার আগেই ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করতে হয়, এমনকী এলাকা পর্যন্ত ছাড়তে হয়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট জীবন অতিবাহিত করতেন। সাচ্চা কমিউনিস্ট নির্ধারণের মাপকাঠিতে তিনি সাচ্চা কমিউনিস্ট। সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, মমত্ববোধ, একাগ্রতা, আদর্শবোধে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট প্রতীক। তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রশ্নাতীত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান ইত্যাদি কত বড় বড় পদের দায়িত্ব সামলেছেন, 'সমবায় রত্ন', 'বর্ষসেরা সমবায়ী' ইত্যাদি নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পরিচিত আন্তরিক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ই থেকে গেছেন, সঙ্গে থেকেছে খাবার হিসাবে প্রায় তেলহীন নুনহীন সেদ্ধ শাক-সব্জি সমেত একটা টিফিন বাক্স। এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট সত্তার একটা বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর পরিবার। কমিউনিস্ট পরিবার। স্ত্রী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যা, বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যা। একমাত্র সন্তান মেয়ে অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায় (তোতা) যৌবনে প্রয়াত। খুবই মর্মন্তুদ। কিন্তু এই দম্পতির রাজনৈতিক কার্যকলাপে কোনদিন ছেদ পড়েনি, এখন যেমন স্ত্রীর পড়ছে না।

এই প্রসঙ্গেই এসে যায় কমল গায়েন ও কাকলি গায়েনের কথা। বিশ শতকের সাতের দশক। আধ্যা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। পূর্বতন অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা (বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) জেলা থেকে যুবক কমল গায়েন আসেন বর্ধমান শহরে জীবিকার সন্ধানে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জেলে। তোতা খুবই ছোট। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। তবু কমল গায়েনের স্থান হলো এই পরিবারে। শুধু স্থান হলো না, তিনি পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলেন, হয়ে উঠলেন তোতার 'কাকু'। জীবিকার সন্ধানের পরিবর্তে কমল গায়েন নেমে পড়েন সমাজতন্ত্রের সন্ধানে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বক্ষণের কর্মী হন এবং পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য থাকাকালীন শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ২০১২ সালে তৃণমূল কংগ্রেসী ঘাতকবাহিনী পার্টির আর এক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদীপ তা সহ কমরেড কমল গায়েনকে নৃশংসভাবে খুন করে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে থাকাকালীনই কমল গায়েনের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরও তাঁরা এই পরিবারেই থেকে যান। কমল গায়েনের স্ত্রী কাকলি গায়েন পার্টিসভ্যা ও এখনও সক্রিয়।

সমবায়ী পরিচয়

১৯৬৮-৮৯ সালে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন। সমবায় পরিচালনায় সেই শুরু। তারপর তার বিস্তার ঘটে সর্বভারতীয় স্তরে, স্বীকৃতি মেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সমবায় সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাধর্মী বই, 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' সমবায়ী ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী ছিলেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবেই শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি। কিন্তু, এখন বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রে? অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যদি কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যায়, মার্কসবাদী হিসাবে অবশ্যই সে উদ্যোগ নিতে হয়। তাই সমবায়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। তাঁর সম্পর্কে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচী মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু শুধু আন্দোলন দিয়ে তো মরণোন্মুখ চাষিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাকে দিতে হবে পুষ্টির জন্য আয় ও উপযুক্ত কাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্ত সুযোগ তার সামনে এগিয়ে দিয়ে তাকে স্বাধীন দেশের নাগরিকের

মতো বাঁচতে দিতে হবে। সেইখানে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ডাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত এক দশক ধরে দেশের মধ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তার মধ্যে দিয়ে গরিব মানুষের সঞ্চয় ও কর্মক্ষমতাকে সংহত করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আয় করার চেষ্টাকে প্রণোদিত করা হচ্ছে।" (মুখবন্ধ, স্বনির্ভরতার সন্ধানে) 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবায় সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ সংকলন।

সমবায় নিয়ে তো অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটাছুটি ছিল, গরিব মহিলাদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ায় প্রত্যন্ত গ্রামে ঘোরাঘুরি ছিল। তাঁর মতে, "পুঁজির অভাব আমাদের নেই, সেই পুঁজি রয়েছে আজ লক্ষ লক্ষ গরিব শ্রমজীবী মানুষের ঘরে। তাঁদের সংগঠিত করতে হবে সমবায়ে। এতদিন আমরা সমবায় করেছি; কিন্তু সমাজের ভিত্তি, সমাজের গরিব অংশ এতদিন ছিল সমবায়ের আঙ্গিনার বাইরে। স্বয়ম্ভরতা, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই নির্ধন গরিব মানুষকে আজ আমরা সংগঠিত করছি "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী—সমবায়ের মধ্যে সমবায়ে"। আজ তাই প্রয়োজন শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মধ্যবিত্ত, মহিলা, সমবায় কর্মী-সহ সমস্ত মানুষের এগিয়ে আসার।" (ভূমিকা, স্বয়ম্ভরতা ও সমবায়ে পেশাদারিত্ব) ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলায় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা জানার জন্য নোবেল-জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে আলোচনা করতে 'নতুন চিঠি' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে সঙ্গী করে তিনি বাংলাদেশে যান।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সম্ভব হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ১১,৪৫,৬০৭ জন সদস্য (৯১ শতাংশ মহিলা) নিয়ে ১,৪০,৬৩০টা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করা। বামফ্রন্ট সরকারের এটা অন্যতম সাফল্য। আর সেই সাফল্যের অন্যতম রূপকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমবায় পরিচালনায় কমরেড অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায়ের নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি সদসতর্ক থাকতেন, বারে বারে সমবায়ীদের সেসব স্মরণ করিয়ে দিতেন। প্রাসঙ্গিকভাবে মূল্যবোধগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে—আত্মনির্ভরশীলতা, নিজ দায়িত্ববোধ, গণতন্ত্র, সমতা, নিষ্ঠা, সততা, খোলামেলা সামাজিক দায়িত্ববোধ। তার কাজে-কর্মে, রেখায়-লেখায় এই দিকটা ফুটে উঠতো। তাই কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সংকলন, 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে'-এর মুখবন্ধে অমিয় কুমার বাগচী লিখেছেন, "শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণির স্বার্থে সংগ্রামের সংকল্পের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃঢ় গণতান্ত্রিক মনোভাবও তাঁর লেখার বিভিন্ন অংশে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি যেমন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংগঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের কাজ নির্দেশ দান নয়, খবরদারি নয়—পর্যবেক্ষণ করা, সহায়তা করা, লালনপালন করা। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সহজে মেশার ক্ষমতার ওপরেও তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন।"

সম্পূর্ণ মানুষ

চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একেবারে সাধারণ, কিন্তু চিন্তায়-ভাবনায়, কাজে-কর্মে অসাধারণ। তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি বলতে পারতেন—

লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।। —বর্ষশেষ

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। জীবনের প্রতি আস্থা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, মানুষের প্রতি বিশ্বাস অমলিন ছিল। এই-রকম মানুষই তো জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

লেখক : *মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য।*

আমাদের উজ্জীবিত করার জন্য অশোকদা আর নেই

অমল হালদার

১৯৭১ সালের কোনো এক সময়ে জেলখানাতে আমার বাবার সাথে দেখা করতে যাই, আমার বাবা তখন একটি মিথ্যা মামলায় জেলে ছিলেন। সেই সময় আমি ছিলাম শ্যামসুন্দর কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক। স্বাভাবিকভাবে বর্ধমান শহরের তৎকালীন সময়ে জেলখানা যাওয়ায় অনেকটাই ঝুঁকি ছিল। পরে এই যাওয়াকে কেন্দ্র করে রানিগঞ্জে একটি ছাত্রদের সভায় নিরুপম সেন প্রচণ্ডভাবে ধমক দেন। প্রসঙ্গ পাল্টে এবার জেল-গেটের দৃশ্যে ফিরে আসি। অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করছেন বৌদি ও ছোট্ট তোতা। আমি অশোকদাকে চিনতাম না, আমার বাবা পরিচয় করিয়ে দেন। অশোকদা একটু চমকে যান, একটু পাশে ডেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেন। সেদিনই দেখি দিলীপদাকে। জেলখানার বড় বড় রড ধরে সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক তরুণকে কথা বলতে দেখে খুব নজর কেড়েছিল, অশোকদাই বললেন ওর নাম স্বপন ব্যানার্জী। দিলীপদাকেও চিনিয়ে দিলেন আমার বাবা। এঁদের অনেকের নাম জানতাম কিন্তু কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বাবা নব্বই দিন পর জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে শুধু জেলখানার গল্প বলতেন। কিন্তু কী কারণে জানি না অশোকদার সঙ্গে সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর অমিয় দাঁর (মন্টু) সঙ্গে কয়েকবার আমাদের বাড়ি গেছেন, তখন আমি এস.এফ.আই-এর জেলা সম্পাদক। বিভিন্ন কাজে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে রাজবাটি গেলে অশোকদার সাথে দেখা করতাম, জিজ্ঞাসা করতেন গোপালদা কেমন আছেন? অনেকক্ষেত্রেই মৃদুলদার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সেই সময়েই লক্ষ করতাম বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামীর মতো নেতৃত্বের কাছে তিনি অত্যন্ত কাজের মানুষ হিসেবে প্রশংসিত হতেন। বর্ধমানে একটি সময় সুশীল ভট্টাচার্য্যের হাত ধরে 'নতুন পত্রিকা' প্রকাশিত হতো। ৭০ দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসে নেতৃত্ব যখন আত্মগোপনে কিংবা এলাকাছাড়া হয়ে যান, তখন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। '৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হবার পর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবার তার নাম দেওয়া হয় 'নতুন চিঠি'। যতটুকু স্মৃতি সাহায্য করছে এই নামকরণটাও অশোক ব্যানার্জীর। তিনিই সামনে থেকে এই পত্রিকা নতুন কলেবরে প্রকাশিত করার ক্ষেত্রে কার্যত সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চরিত্রের যেন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যখন যে কাজটা করতেন সেক্ষেত্রে

অন্যমনস্কতার কোনো ছাপ থাকতো না। পার্কাস রোডে শহিদ প্রভাত কুণ্ডু ভবন বর্তমানে যেখানে অবস্থিত, ওইখানে একটা রান্নাঘর ছিল, পাশে একটা ছোট ঘর ছিল। তখন কমিউনে স্থানাভাবের জন্য অশোকদা ওই ঘরে কাজ করতেন। আমি তখন কমিউনেই থাকতাম। রাত্রে যখন আমি, বিবেকদা অনেকেই রান্নাঘরে যেতাম, লক্ষ্য করেছি অশোকদা কাজ করছেন, আমাদের ডেকে বসাতেন। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার শুরুতে অশোক ব্যানার্জীর ভূমিকাকে তখনকার পার্টিকর্মীরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। শুধু 'নতুন চিঠি' নয়, আমাদের অনেকের স্মরণে আছে নির্বাচনের প্রাক্কালে নতুন চিঠির প্রকাশনায় 'তথ্য কথা বলে' একটি ছোট্ট পুস্তিকা বের হতো। বিরোধীপক্ষকে তথ্যের উপর ভিত্তি করে আক্রমণ শাণিত করার জন্য এই বইয়ের একটা রাজ্যজুড়ে চাহিদা ছিল। বড়, মেজ, ছোট সব বক্তাই এই পুস্তিকাটি নিয়ে পড়াশুনা করতেন। প্রায় দু'মাস ধরে অজস্র সংবাদপত্র ঘেঁটে গভীর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পুস্তিকাটি তৈরির মূল কাণ্ডারী ছিলেন অশোকদা। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে এই পুস্তিকাটি আমাদের ভাবতে সাহায্য করতো, আমাদের ভাবাতো। অনেক প্রাসঙ্গিক বই পড়ার ইচ্ছা তৈরিতে সাহায্য করত। নতুন চিঠি প্রকাশনার অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে, আমি তার বিস্তারিত তথ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু উল্লেখ করতেই হয়, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ' নামক যে গ্রন্থটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সৈয়দ শাহেদুল্লা লিখেছিলেন। বইটি দিনের আলো দেখার ক্ষেত্রে অশোকদা সহ নতুন চিঠির কর্মীদের অসামান্য অবদান ছিল। বিশেষত দিনেশ ঝা-র একটা বড় ভূমিকা ছিল। দীর্ঘকাল 'নতুন চিঠি'র সাথে যুক্ত থাকাকালীন বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের সাথে। প্রথমে বর্ধমান জেলা, পরবর্তীকালে রাজ্য জুড়ে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। রাজ্য জুড়ে সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কেউ ভুলতে পারবে না। বিশেষ করে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকা আজও রাজ্যের বহু জেলা, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ কিছু জেলার কমরেডরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি পেয়েছিলেন চিত্ত ব্যানার্জীকে, জেলার অভ্যন্তরে সমবায় আন্দোলনের প্রসারে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেউ ভুলতে পারব না। সততা, স্বচ্ছতা অমায়িক ব্যবহার। অশোকদা শিখিয়েছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীকে সমবায়ের খুঁটিনাটি আইনকানুন। ছুটে বেড়াতেন জেলার সর্বত্র। অদ্ভুত ঘটনা, দুজনেই ছিলেন হাই-সুগারের রোগী। কিন্তু তাঁরা রোগকে পিছনে ফেলে কেউ জেলা আবার কেউ রাজ্য তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। আমরা মাঝেমাঝে স্বাস্থ্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা এই রোগকে পাত্তা দিতেন না। কিছুদিন আগে চিত্তদা চলে গেলেন। গ্রামের বাড়িতে যখন সমবায়-কর্মীরা ছাড়াও সর্বস্তরের কর্মীরা হাজির হন, অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে যান তাঁর বাড়ির অবস্থা দেখে। এই সততা আমরা জানতাম, সেদিন প্রত্যক্ষ করলেন বিরোধী অংশের কর্মীরা। কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেছেন কিন্তু অশোকদার এই সুযোগ্য শিষ্য কোনোদিন নিজের সংসারের কথা ভাবেননি। এই দৃষ্টান্তগুলিই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে প্রেরণা দেয়।

অশোকদা যখন সমবায় আন্দোলনের মধ্যগগনে তখন বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামী, নিরুপম সেন সহ নেতারা মজা করে অশোকদাকে বলতেন 'সমবায়ের বাল্মীকি'। যিনি নামকরণ করেছেন তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। যখন আমি পার্টির জেলার সম্পাদক, প্রায়ই এই আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অজস্র পরামর্শ দিতেন, বিশেষ করে নজর দিতে বলতেন গ্রামের গরিবদের দিকে, সার্বজনীন সদস্য করার বিষয়ে। পার্টিগতভাবে কালাচাঁদ নাথ বিষয়টি দেখতেন। কখনো আমাদের দুজনকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতেন। যা বলতেন তা সবটা পারিনি। কিন্তু কোনোদিন তাঁর মতামতকে উপেক্ষা করিনি। বর্ধমান জেলায় 'সংকল্প' প্রতিষ্ঠার পর বারে বারে ছুটে যেতেন সালানপুরের আদিবাসী এলাকায়। রুক্ষ্ম জায়গায় জলের যোগান, বনভূমি সহ নানা প্রকল্পে ওই এলাকার আদিবাসীদের প্রাণের মানুষে পরিণত হন। মদন ঘোষ যেতেন, আমিও কয়েকবার গেছি। সত্যিকারের ঘটনা হলো, যে পরিবেশ তিনি তৈরি করেছিলেন, ওখানে গেলে ফিরে আসতে মন চাইতো না। অশোকদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেখালেখির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অনেকগুলি বই লিখেছেন কিন্তু 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' বইটি ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মানের। এই বইটি সমবায় আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর পড়া উচিত।

ব্যক্তিগত জীবনেও বড় আঘাত আসে, একমাত্র প্রাণপ্রিয় কন্যা তোতার আকস্মিক মৃত্যু হয়। এই ধাক্কাও তিনি সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু প্রদীপ ও কমলদা যেদিন খুন হলেন সেদিন অশোকদাকে ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। তাই যত কর্মসূচি থাক না কেন ২২ ফেব্রুয়ারি প্রদীপ ও কমলদার স্মরণসভায় মাল্যদান করে নিজের জায়গায় নীরব থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

২০১১ সালের বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সমবায় আন্দোলনের উপর প্রবল আঘাত নেমে আসে। এক সময় যে কৃষকরা সহজশর্তে ঋণ পেত সেগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। বলপূর্বক সমবায়গুলিকে দখল অভিযান শুরু হয়। শাসক পার্টির লোকেরা নিজেদের লোক ঢুকিয়ে তছনছ করা শুরু করে। এই অবস্থায় অশোকদার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'সমবায় বাঁচাও' আন্দোলন। আমাদের জেলায় দুর্যোধন সর সহ কিছু সমবায়কর্মী এই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালায়। অশোকদা রাজ্যময় ছুটে বেরিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। আক্রমণের মোকাবিলায় ছিলেন অশোক ব্যানার্জী। আজ কেন্দ্রীয় সমবায়ের অর্ডিন্যান্সের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছে। বিপন্ন সমবায় কর্মচারীদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না। সমবায়ের হাজার হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করতে চায়। রাজ্য সরকার নীরব। আগামী দিনে কৃষক আর সমবায় থেকে ঋণ পাবে না। মহাজনদের কাছে কৃষকদের যেতে বাধ্য করবে। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বিপর্যস্ত হবে কৃষক। এর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন আজকের নতুন প্রজন্ম। লড়াই চলছে চলবে, কিন্তু এত বড় আক্রমণের মুখে আমাদের উজ্জীবিত করার জন্য অশোকদা নেই। এই অনুপস্থিতি আমরা সকলেই অনুভব করছি। কমরেড অশোক ব্যানার্জী লাল সেলাম।

লেখক : *সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও কৃষক নেতা।*

কমরেড অশোক ব্যানার্জী—প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অচিন্ত্য মল্লিক

চলে গেলেন অশোকদা—কমরেড অশোক ব্যানার্জী। বর্ধমান জেলা শুধু নয়, গোটা রাজ্যেই গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীদের একটা অত্যন্ত পরিচিত নাম অশোক ব্যানার্জী। গত ২৯ মার্চ প্রয়াত হলেন তিনি। জীবনের শেষ কয়েকটা মাস মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন তিনি। কিছুদিন কখনো নার্সিংহোমে, কখনো বাড়িতে চিকিৎসা পরিষেবার ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কাজে ফিরেছেন। কিন্তু এবারে শেষ ধাক্কা সামলাতে পারলেন না।

না, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হতে পারিনি। লকডাউনের শুরুতেই কয়েকদিন কাটোয়ায় থাকার ফলে আসতে পারিনি তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তখন লকডাউন সবে শুরু হয়েছে। করোনা সংক্রমণের সতর্কতা এবং লকডাউনের ফলে বন্ধ পরিবহন ব্যবস্থার কারণে অশোকদার সুহৃদ, অসংখ্য গুণমুগ্ধ কমরেড পারেননি তাঁর অন্তিম যাত্রায় যোগ দিতে।

বয়সের বিচারে একেবারে অসময়ে অশোকদা চলে গেলেন বলা যাবে না ঠিকই। কিন্তু সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাড়ির বাইরে বেরোবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্যকে ব্যবহার করেই মনের জোরে সমস্ত কর্মসূচিতে হাজির থেকেছেন। আমরা যখন বলেছি, 'এই শরীরে আপনি এলেন কেন?' উত্তরে বলেছেন, 'পারছি তো, আসতেই হবে যতক্ষণ পারবো।' এই মানসিক জোর আর পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতার বোধ ছিল কমরেড অশোক ব্যানার্জীর—যা আমাদের সকলের কাছেই অনুকরণীয়।

সম্ভবত মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়েছিল অশোকদাকে। খবর পেয়ে তাপস (তাপস সরকার) আর অপু (অপূর্ব চ্যাটার্জী)-র সাথে দেখতে গেলাম নার্সিং হোমে। গৌরীবৌদিও ছিলেন তখন সেখানে। অশোকদা নিজেই বললেন, 'ভালো আছি, কাল মনে হয় ছেড়ে দেবে।' সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়িও চলে এসেছিলেন। কিন্তু, ক'দিনের মধ্যেই আবার ভর্তি হতে হয় নার্সিংহোমে। এই ধাক্কা সামলাতে পারলেন না আর। এরও বেশ কিছুদিন আগে সর্বমঙ্গলা পার্কে কমরেড হিজুর স্মরণসভায় গিয়ে সভা শেষে অশোকদার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দেখতে গেলাম অশোকদাকে। কত মনের জোর, বললেন—'ভালো আছি, উঠে পড়বো তাড়াতাড়ি'। শয্যাশায়ী অবস্থাতেই বললেন।

তখন অশোকদা নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে ভুতি (তরুণ রায়)-দের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। মনে হতে পারে হঠাৎ করে এই বিষয়টা কেন উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অশোকদার অনেক গুণাবলীর মধ্যে এক্ষেত্রেও পার্টির প্রতি তাঁর দরদ, ভালোবাসা, আস্থা, দায়বদ্ধতার একটা বিশেষ দিক উল্লেখ করতেই হয়। বাড়ি বিক্রির পর অশোকদা এবং গৌরীবৌদি একসঙ্গে দুজনে অফিসে এলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে, পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার ভিত্তিতেই। অশোকদা বললেন, "দেখো বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল, কয়েকদিন পরে ভূতিদের বাড়িতে গিয়ে উঠবো। বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে পার্টিকে আমি কিছু সাহায্য করতে চাই।" তৈরি হয়েই এসেছিলেন। গৌরীবৌদির ব্যাগ থেকে এক লক্ষ টাকার একটা চেক বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি অভিভূত। অশোকদার চরিত্রের এও এক বিরল দৃষ্টান্ত। পার্টির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার চেতনার উদাহরণ পার্টিকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

অশোকদাকে আমার প্রথম দেখা ১৯৭১ সালে, মাসটা মনে নেই। তখন PVAA (Prevention of Violence Activities Act) আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে বর্ধমান জেলে বন্দী। হঠাৎ খবর এলো, দেখলাম নেতৃত্বের কমরেডরা (কমরেড বিনয় কোঙার এবং অন্যন্যরা) অশোকদাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু পুলিশ এবং কংগ্রেসি সমাজবিরোধীরা তাঁর উপর যে শারীরিক নির্যাতন করেছে, তাতে তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। জেলগেট থেকে স্ট্রেচারে করে জেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হবে। তখনও জেলে লক-আপ (আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ) হয়নি। আমরা কয়েকজন জেলগেট থেকে জেল হাসপাতাল যাবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম—অশোকদাকে দেখতে। সেই প্রথম দেখা অশোক ব্যানার্জীকে। পরের দিন আমাদের কয়েকজনের ওপর দায়িত্ব পড়লো জেল হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যাবার নাম করে অশোকদার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য।

সবটা করে (আগ বাড়িয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলে) নেতৃত্বকে রিপোর্ট করলাম। তারপরের কাজ নেতৃত্বের। কত ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায়, কত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা যায় অশোকদাকে। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরে (বেশ কয়েকটা দিন পর) জেলখানাতে আমরা একই ঘরের বাসিন্দা। সেই প্রথম পরিচয় অশোকদার সাথে।

তারপরে বেশ কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেছে। মাঝখানের বছরগুলিতে তাঁর সঙ্গে আর সেভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হবার সুযোগ ঘটেনি, আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ১৯৮১ সালে কাটোয়ায় অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলন থেকে আমরা যারা নতুন জেলা কমিটির সদস্য হয়েছিলাম, অশোক ব্যানার্জী তাঁদের মধ্যে একজন। তারপর থেকে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ। কাজের ক্ষেত্রে আলাদা হলেও কমরেডসুলভ সম্পর্কের মধ্যেও একটা নৈকট্য তৈরি হয়েছিল।

সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, নেতৃত্বদান সম্পর্কে আমার কিছু লেখা মানায় না। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, লড়াই, পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রবীণ পার্টিনেতা হিসেবে আমরা চেষ্টা করেছি তা যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার। বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত পার্টির গত জেলা সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পার্টির জেলা কমিটি কমরেড ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জীবনকে স্বীকৃতি দিতেই তাঁর ওপরই পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল।

অশোকদা চলে গেলেন। এটাই নিয়ম। কিন্তু, অশোকদা যে শিক্ষা আমাদের সামনে রেখে গেলেন তা স্মরণে রেখে সেই শিক্ষা প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কমরেড অশোকদা লাল সেলাম। কমরেড অশোক ব্যানার্জী অমর রহে।

লেখক : *সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক।*

অশোক জেঠুকে যেমন দেখেছি

আভাস রায়চৌধুরী

অশোক ব্যানার্জি নামটা আমি প্রথম শুনি আমার শৈশবে, সাতের দশকের প্রথম ভাগে, পশ্চিমবঙ্গে তখন আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময়, আমাদের পরিবারে তার যতটুকু ছোঁয়া লেগেছিল এমনই অবেলায়। পরিবারের এবং পাড়াপড়শিদের নিয়ে বৃহত্তর পরিবারের সবাই যখন একটি খবরের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, অনেকেই বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছিলেন, তখন জেল থেকে অশোক ব্যানার্জীর পাঠানো খবরে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এসেছিল। আমার তখন বোঝার বয়স ছিল না, বুঝিওনি, তবে শুনেছিলাম। এখানে আমার বা আমাদের পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা নয়, কথা বলা অশোক ব্যানার্জিকে নিয়ে। কমরেড অশোক ব্যানার্জিকে 'কমরেড' বলেছি অনেক পরে, ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সময়। আমার শৈশবে দেখা সময় থেকে অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই এক পরিবারভুক্ত ছিল। ছোট বড় সমস্ত ঘটনার সুখ-দুঃখের ছোঁয়া প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এসে লাগত বোধহয়, অন্তত আমার দেখা পরিসরে তো বটেই। আমাদের ছোটদের কাছে তাই বড়দের সম্পর্কগুলো ছিল জেঠু, কাকু, মামা বা জেঠিমা, কাকিমা, মামিমা। অশোক ব্যানার্জিও সেইরকম আমাদের কাছে ছিলেন অশোক জেঠু।

অশোক জেঠুর সঙ্গে কয়েক বছর সিপিআই(এম) পার্টির জেলা কমিটিতে কাজের সুযোগ পেলেও সাংগঠনিক কাজের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। ওই সময় আমার পার্টির কাজের ক্ষেত্র ছিল আসানসোল শিল্পাঞ্চল। আর উনিও তখন সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সারা রাজ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তাই অশোক ব্যানার্জি কেমন সংগঠক ছিলেন তা মূল্যায়ন করতে যাওয়াটা আমার পক্ষে বেমানান এবং অনুচিতও বটে। আমরা সবাই জানি অশোক ব্যানার্জি কৃষক আন্দোলন করেছেন। আর সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এ রাজ্যে সর্বজনবিদিত। যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুবাদে কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্ব হিসাবেই যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই আমাদের কাছে তিনি অশোক জেঠু। এবং দেখা হওয়ার শেষ দিনটি পর্যন্ত জেঠু সম্বোধনই অটুট ছিল। আমরা যারা সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের বৃহত্তর একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে মেয়ে

ছিলাম, কমরেড গৌরী ব্যানার্জিকে কখনোই জেঠিমা বলিনি, কারণ এই বৃহত্তর একান্নবর্তী পরিবারে আমাদের এক বন্ধুর পিসির সহকর্মী হওয়ার সূত্রে গৌরী ব্যানার্জি আমাদের গৌরী পিসি। অশোক জেঠু, গৌরী পিসি -- এ এক অদ্ভুত সম্বোধন আমাদের ক'জনের কাছে। আসলে এই পার্টি-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কোনদিনই পারিবারিক অনুভূতির বাইরে থাকেনি। তবে এর মানে এই নয় যে পার্টি, রাজনীতি, তার থেকে পারিবারিক সম্পর্ক বড়। আমি নিশ্চিত এমন বহু মানুষ আছেন, এমন বহু কমরেড আছেন যাঁদের সঙ্গে অশোক জেঠু-গৌরী পিসিদের এ ধরনের সম্পর্ক রয়েছে।

বর্ধমানের গোদা অঞ্চলে পার্টির কাজে যুক্ত থাকার সময় কাছ থেকে অশোক জেঠুকে সাংগঠনিক কাজে দেখেছিলাম। নির্বাচনের সময় কাজের চেকআপ করতে মাঝে মাঝে আসতেন মদনদা এবং প্রায়শই অশোক জেঠু। শ্যামদা, তাপসদা, সুবীরদা—তাঁরা তো থাকতেনই। আমি তখন ওই এলাকা ব্রাঞ্চের পার্টির সদস্য এবং তখন অবশ্য খানিকটা ভয়ই পেতাম ব্রাঞ্চে অশোক ব্যানার্জি আসবেন শুনে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খোঁজ নিতেন সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি ও এলাকার পরিস্থিতির। ওঁর যেন কিছুতেই মন ভরতো না। মাঝে মাঝে মনে হতো আমরা কি কিছুই করছি না! আমাদের চোখের ভাষা পড়ে শেষকালে উৎসাহিত করতেন। আমাদের এলাকায় অশোক জেঠুর আসার কোন সময়ের ঠিক ছিল না। কখনো ভর দুপুরে কখনো বেশ রাত্রে। পরে বুঝেছি আসলে কমরেডরা সদা-সতর্ক আছে কিনা, কোনো আত্মতুষ্টিতে ভুগছে কিনা, কিংবা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, সেটা বুঝে নিতে

চাইতেন। কাজের এই ধারার মধ্য দিয়েই নতুন কর্মীরা ভবিষ্যতের সংগঠক হয়ে ওঠে। আমরা যেন এই ধারা রক্ষা করতে পারি। কথায় কথা বাড়ে। ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজে এত কম অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার আর কথা বাড়ানো উচিত নয়।

সবাই জানি সাতের দশকে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর শিকার হয়েছিলেন তিনি। বাকি জীবনটা তার প্রভাব বহন করতে হয়েছে ওঁকে। সন্তানের মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর পারিবারিক বিপর্যয়ের পথ পেরোতে হয়েছে ওঁদের। তবুও ওঁরা অবিচল অটল ছিলেন। আসলে গৌরী পিসি প্রকৃত অর্থেই জীবনসাথী, কমরেড। তাই অশোক জেঠুর কথা এলে গৌরী পিসির কথাও চলে আসে। ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রসঙ্গগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও সবটা সম্ভব হলো না বোধহয়। তাই এবার কথা শেষ করা দরকার।

যদি কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করেন ব্যক্তিগত পরিসরের বাইরে রাজনৈতিক মানুষ অশোক ব্যানার্জীর কাছ থেকে আমরা কী কী শিখতে পারি? আমার ধারণা অন্যেরাও আমার সাথে সহমত হবেন—মানুষকে ভালোবাসা, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, প্রবল যন্ত্রণাতেও অবিচল থাকা, রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থাতেও আশার রুপোলি রেখা সন্ধানের চেষ্টা করা, কাজে লেগে থাকার জেদ ও দক্ষতা এবং প্রশ্নাতীত সততা। আবার বলি, ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়নি আমার। অনেকটাই অগ্রজ প্রজন্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা। তাই আমার চোখের আড়ালে থাকা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। সমাজের মতোই ব্যক্তি-মানুষের জীবনও দ্বান্দ্বিকতায় বাঁধা। অশোক জেঠুর জীবনও নিশ্চয়ই তার বাইরে নয়। অশোক জেঠু, কমরেড অশোক ব্যানার্জীর যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমি উপলব্ধি করেছি তার কোনটাই একজন সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ গুণ নয়, বরং একেবারে স্বাভাবিক। বিশেষত কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে তো বটেই। তাই শরীরী প্রয়াণের পরে আমরা এখন দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি কমরেড অশোক ব্যানার্জি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট।

লেখক : *সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।*

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে
তাঁর জীবনসঙ্গিনী ও সহযোদ্ধা গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

[অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী ব্যানার্জী—একসাথেই উচ্চারিত হয় দুটি নাম। গৌরী ব্যানার্জী শুধু অশোক ব্যানার্জীর সহধর্মিণী বা সহযোদ্ধা নন, একে অপরের পরিপূরক। আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে গৌরী ব্যানার্জীকে পত্রিকার প্রাণপুরুষ অশোক ব্যানার্জী সম্পর্কে একটি লেখা দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। অনুরোধ করেছিলেন সম্পাদক। সে প্রসঙ্গে গৌরী ব্যানার্জী জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর কথা প্রশ্নোত্তরে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানাবেন। সম্পাদক এ দায়িত্ব দেন শিবানন্দ পাল ও দিনেশ ঝা-কে। কিন্তু বর্ষীয়ান সাংবাদিক রামপ্রণয় গাঙ্গুলী এ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে চান। তিনি গলসি থেকে গৌরী ব্যার্জীকে চেনেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিতি। আলোচনান্তে ঠিক হয় রামপ্রণয় গাঙ্গুলী সাক্ষাৎকারটি নেবেন।

গৌরী ব্যানার্জী জীবন ও লড়াইয়ের বহ্নিশিখা। মাত্র দু-বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ, তারপর দেশভাগ-দেশত্যাগ। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে পড়াশোনা। কখনো বর্ধমান জেলার রসুলপুরে তো কখনো

বিহারের চম্পারণ জেলায় বেতিয়ায়। বেতিয়ায় থাকতেন চিকিৎসক কাকা। পুনরায় বর্ধমান জেলার রসুলপুর—মেমারিতে। এখান থেকেই মাধ্যমিক। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ই যিনি তাঁকে স্বাবলম্বী বানিয়েছিলেন সেই ঠাকুরদার মৃত্যু। এর পর ছোট ভাই, পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন-সংগ্রাম। শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজের যোগ্যতাকে বিকশিত করার কাজ চালিয়েছেন অবিরাম। প্রাইভেটে আই.এ, পরে বি.এ পাশ করেছেন। হয়েছেন হাইস্কুলের শিক্ষক। সেখান থেকে গণ-আন্দোলনে। প্রতিকূলতা হার মেনেছে তাঁর কাছে। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন সাহসের সঙ্গে, মাথা উঁচু করে। বিবাহ—খানিক দুই বিপরীত শিবিরে। একজন এবঙ্গীয়, অপরজন পূর্ব বঙ্গীয়। কিন্তু দুই পরিবারে উন্নত চিন্তা-চেতনার ও সহমর্মিতা মিলে-মিশে এক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। লড়াই-সংগ্রাম—লড়াইয়ের বীক্ষায় সব প্রতিকূলতা ঠেলে এগিয়ে চলেছেন গৌরী ব্যানার্জী, জীবন-সংগ্রাম থেকে সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে, এখন সর্বমঙ্গলা পাড়ার রায়বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের 'গৌরিদি' হয়ে।]

□ আপনার জীবনসঙ্গী ও সহযোদ্ধা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিরতরে হারানোর সুগভীর বেদনা বহন করে কীভাবে এগিয়ে চলেছেন?

আমার অ-শোক জীবনযাত্রার মূলে সার্থকনামা অ-শোক ব্যানার্জী। যাঁর জীবনে হতাশার কোনো স্থান ছিল না। এতো শোক, যন্ত্রণা, এতো কষ্টও তাঁকে কোনোদিন বিচলিত করতে পারেনি, তাঁর কর্তব্য-কর্মে কোনো অবহেলা দেখা যায়নি। একমাত্র কন্যা তোতা-র অকালমৃত্যু, অসীম স্নেহভাজন ভ্রাতৃতুল্য কমল গায়েনের শহিদ হওয়া, নিজে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় একমাত্র ভাইপো-র অসময়ে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বণ্ডে সই করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাত দুটোয় একটা গাড়ি জোগাড় করে বর্ধমানের 'শরণ্যা' চিকিৎসালয়ে চলে এসে তাঁর দেহ গ্রহণ করা ও পোস্টমর্টেম করানো, স্থির মস্তিষ্কে অসুস্থতা নিয়েও যাবতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করা, এবং কয়েক মাস পরেই তাঁর ভাই-এর মৃত্যু—এতো রকমের বিপর্যয় ও প্রবল শোক সত্ত্বেও তাঁর জীবনের প্রতি কোনো বিতৃষ্ণা বা আর বেঁচে থাকায় কোনো অনীহা কখনো দেখা যায়নি। বরং বলতো, লড়াই-আন্দোলন করে বেঁচে থাকাই তো জীবন। এমন একজনের জীবনসঙ্গিনী, সহযোদ্ধা হয়ে আমাকে তো দুঃখ-শোকে কাতর হলে চলবে না। তোতা চলে যাবার পর আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে হাঁটতে পারছিলাম না। সবসময় সঙ্গে থেকে অনেক চেষ্টা করে হাত ধরে হাঁটাতে হাঁটাতে সে আমাকে চলতে সক্ষম করে তোলে শুধু নয়, জীবনের বাকি পথটাও শক্ত হয়ে চলার শক্তি জুগিয়ে দেয়।

□ আপনাদের বিবাহ-পূর্ব জীবনকথা ও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার পশ্চাৎপটটা যদি একটু বলেন।

বৃহত্তর পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আমি বড় হয়েছি। দু-বছর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। অত্যন্ত সহনশীল ও ধৈর্যশীলা আমার মা ও ঠাকুমার কাছ থেকেই সবকিছু মানিয়ে চলা, সহনশীলা হবার শিক্ষা আমি পেয়েছি। ঠাকুরদা-ই পিতৃস্নেহে আমাকে পালন করেন। যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে—এই বোধ আমার মধ্যে জাগ্রত করার পিছনে ছিল তাঁরই প্রেরণা। তিনি নিজে আমাকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছেন। পড়াশুনা করে স্বাবলম্বী হতে হবে, এই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। মেমারির রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ি, কিন্তু নবম শ্রেণিতে বিদ্যালয় কোনো ছাত্রী না পাওয়ায় ওখানে আর পড়া হলো না। ১৯৫৬ সালে ১৫ বছর বয়সে রসুলপুর (বৈদ্যডাঙ্গা) স্কুল থেকে প্রাইভেটে স্কুলফাইনাল পাশ করি। পরের বছরই, ১৯৫৭ সালে, ১৬ বছর বয়সে মেমারির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করি। মেমারিতে ঘর ভাড়া করে মা ও ভাইকে নিয়ে থাকি। নির্দিষ্ট সালের এক বছর পর সহপাঠীদের বই-পত্তর চেয়ে নিয়ে আই.এ ও বি.এ পাশ করি। জীবনে কলেজে পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। প্রাইভেট টিউশনিও করতে হতো সংসার চালাবার জন্য।

যখন বি.এ পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, সেই সময়েই মেমারি ব্লক অফিসে চাকুরিরত অশোক ব্যানার্জী প্রাইভেটে বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য মা-বাবাকে নিয়ে এই বাড়িতেই দু-মাসের জন্য ঘর ভাড়া করে। তখনই তার সাথে আমার পরিচয়। একটা সময় ওঁরা

ভাতাড়ে থাকতেন এবং অশোক ব্যানার্জী ভাতাড় স্কুলে পড়তো। ওর মামা সুকুমার মুখার্জী তখন ওই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বর্ধমান রাজ কলেজে এসে ম্যাথেমেটিক্স-এ অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। হঠাৎ ওর বাবার চাকুরিস্থলে স্ট্রোক হয় এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসেন। ফলে কলেজের বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় পরীক্ষা না দিয়ে চলে আসতে হয়। সংসার চালাবার জন্য গঙ্গাটিকুরি ব্লক অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরি নেয়। পরে মেমারি ব্লকে এসে প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করে রায়ান স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেয়।

একজন চাকুরিরত যুবকের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক, এইভাবে পড়াশুনা করা—এর মধ্যে আমি আমার জীবনের মিল খুঁজে পাই। ওর বাবা-মারও আমাকে খুব ভালো লাগে। তাই দুই পরিবার মিলে আমাদের বিয়ে দেন। এ-ব্যাপারে বর্তমানে নদিয়া জেলার সিপিআই(এম) জেলা কমিটির সম্পাদক সুমিত দে-র বাবা সুবিমলদার বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমাদের যৌথজীবনের শুরু হলো ১৯৬৪ সাল থেকে। বিয়ের পর রায়ানে ও তার পর বর্ধমানে পীরপুকুরে ভাড়া বাড়িতে থাকি। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে গলসিতে বাড়ি ভাড়া করে চলে যাই। এই বছর আগস্ট মাসে আমাদের কন্যা তোতা-র জন্ম হয়। সেই সময় অশোক ব্যানার্জী কোলকাতায় শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে ১৫ দিন কারাগারে বন্দী থাকে।

□ কবে থেকে কীভাবে আপনি রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন ও কমিউনিস্ট চিন্তাধারা আপনার চেতনার নব-উন্মেষ ঘটালো?

আমি এক রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তাই খুব ধর্মে-কর্মে বিশ্বাসী ছিলাম। বাড়িতে লেখাপড়ার একটা আবহ ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কোনো পরিবেশ ছিল না। সত্যি বলতে কি, তেমন কোনো রাজনৈতিক জ্ঞানই আমার ছিল না। যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, এই বোধ আমার মধ্যে জাগ্রত করার পিছনে ছিল আমার মা ও ঠাকুরদা-র প্রেরণা। মেমারিতে স্কুলে পড়ার সময় কাছাকাছি বাড়ি থাকায় বিনয়দাদের (কমরেড বিনয় কোঙার) পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, হয়তো সেই প্রভাবও আমার জীবনে পড়েছিল। কমিউনিস্টরা বৈষম্যের অবসান চায়, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়—এই কথাটি আমার মনে খুব দাগ কাটে। আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুতেই ঠাকুরদা-র মৃত্যু হয়। তাই সেই সময় থেকেই আমাকে নানা শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। বিয়ের পর কমরেড অশোক ব্যানার্জীই নানাভাবে চেষ্টা করে আমাকে ধর্মীয় গণ্ডী থেকে বার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে।

১৯৭১-৭৩, এই সময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমার সাথী ছিলেন কমল গায়েন, আমাদের কমলদা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার স্বামীর চাকরিসূত্রে তখন আমরা

কেশবগঞ্জ চটিতে ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে থাকি। ২৪ পরগণার লোক কমলদার দাদাও কর্মসূত্রে কেশবগঞ্জ চটিতে থাকতেন, কমলদা দাদার কাছে এসে থাকতেন। তিনি ছোট বয়স থেকেই নিজের এলাকায় কৃষকসভার কর্মী ছিলেন। অশোক ব্যানার্জী তখন মিথ্যা মামলায় জেলবন্দী। ধর্মঘটের সমর্থনে রাতের বেলায় পোস্টারিং করার সময় মিলন নামে এক কমরেড তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে চা খেতে এলো। সেদিনের সেই আগন্তুকই ছিলেন কমল গায়েন। মিলন বললো, বৌদি, আপনি একা থাকেন, কোনো দরকারে এই কর্মীকে কাছে পাবেন। সেই শুরু হয় যাতায়াত। ক্রমে তিনি পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। আমি স্কুলে থাকলে মেয়ের দেখাশুনা করা, তাকে স্কুল দিয়ে আসা—সবই করতেন। দাদার সঙ্গে মনান্তরের কারণে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামে থাকার কথা বলেন। তখন ১৯৭১ সাল, জেল থেকে অশোক ব্যানার্জী অনুরোধ করে থেকে যাবার জন্য। এলাকার কমরেডরাও বলেন। তিনি থেকে যান। আমাদের সুভাষপল্লীর বাড়িতেও পরিবারের সদস্যরূপেই আসেন। ১৯৯১ সালে কাকলির সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়। তখন থেকেই তিনি বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছিলেন। আমার শাশুড়িমাতা বলতেন, কমল আমার ছোট ছেলে। তাই তাঁর নামে আমাদের বাসস্থানের মধ্যেই এক অংশ রেজিস্ট্রি করে দেন।

ওই সময় প্রচণ্ড সন্ত্রাসের মধ্যে কমলদা একটি মিছিল বের করার পরিকল্পনা করেন। বর্ধমান শহর লাগোয়া সরাইটিকর থেকে সদরের গ্রামে গ্রামে মিছিলে হাঁটি আমরা। মিছিল-শেষে বাড়ি ফিরে আমার গায়ে-হাতে-পায়ে যন্ত্রণা ও জ্বর আসে। কমলদা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে দিয়ে বলেন, "হবে না—জানেন কতটা হেঁটেছেন?—১২ মাইল!" রাজনৈতিক কাজের শুরুতে আমার জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি।

□ সঙ্গীত, নাটক সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমেও তো আপনারা রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন? তোতার জীবনেও কি তার প্রভাব পড়েছিল?

নাটকের প্রতি আমার একটু অনুরাগ ছিল। স্কুলে নাটক, আবৃত্তি একটু-আধটু করেছিলাম। সেই জন্য কমরেড মৃদুল সেন ও কমরেড অমল ব্যানার্জীর নাট্যসংস্থায় আমি যুক্ত হই ১৯৬৮ সালে। সেখান থেকেই আমার রাজনৈতিক আঙিনায় প্রবেশ। আমি স্কুলজীবনে দু-একবার নাটকে অভিনয় করেছি। তার পর আর চর্চা হয়নি। কিন্তু অশোক ব্যানার্জীর একটা পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল। ওর বাবা, ভাই গ্রামে যাত্রায় অভিনয় করতো, ও নিজেও করতো। গলসিতে থাকাকালীন যাত্রায় অভিনয় করেছিল, মেমারিতেও চাকরি করার সময় অফিস ক্লাবে নাটকে অভিনয় করতো। এ-ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক ও দক্ষতা দুই-ই ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকতো, অভিনয়ও করতো। তাছাড়া তবলা বাজাতে পারতো, ভালো বেহালা বাজাতো। কলকাতায় শিশিরকণা ধর চৌধুরীর কাছে শিখতো। অত্যন্ত

সঙ্গীতপ্রেমী ছিল—উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও অনুরাগী ছিল। ১৯৬৭ সালে অমল ব্যানার্জী, মৃদুল সেন, অশোক ব্যানার্জী এবং আরও অনেকে মিলে একটি প্রগতিশীল গণসংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'অন্বেষা' নামে শহরের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার গড়ে ওঠে। আমরা দু-আড়াই বছরের কন্যা তোতা-কে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাটক করতে যেতাম, তখন আমরা ওরও নাম রাখি 'অন্বেষা'। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমরা যখন সঙ্গীত-নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরতাম, তখন ও আমাদের সঙ্গে ঘুরতো। তার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই ওর জীবনে পড়ে এবং নিজেকেও ক্রমশ তৈরি করে তোলে, পারিবারিক পরিবেশটাকে মানিয়ে নেয়, সকলকে আপন করে নেওয়ার মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে তার মধ্যে। আবৃত্তি ও নাটকে বেশ সাড়া ফেলে দেয়। মাত্র ৪৩ বছরের জীবন, শেষ বছরটা ছিল ২০০৯।

□ অশোকবাবুর বহুমুখী প্রতিভার অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে যদি কিছু বলেন।

ও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। বিজ্ঞান নিয়ে সর্বদা পড়াশুনা করতো। আধুনিক প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করার প্রবল আগ্রহ ছিল। মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার নিয়মিত ব্যবহার করতো। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও কম্পিউটারে লেখালেখি করতো। পরে দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কারণে আর পেরে ওঠেনি। সাংবাদিকতা ও তার সামাজিক রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি থেকেই ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বর্তমান 'নতুন চিঠি' সপ্তাহিক পত্রিকার সূচনা করে 'নতুন পত্রিকা' নামে। সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে পত্রিকাটিকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিয়ে প্রকাশক হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পত্রিকাটির সাথে, সাংবাদিক সংগঠনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে।

সবরকমের গঠনমূলক, সৃজনশীল কাজেই সে উদ্যোগী ছিল। কৃষিতে 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ ও কৃষকদের উন্নতির জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে 'সঙ্কল্প' সংস্থাটি গড়ে তুলেছে। সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের, বিশেষ করে সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত মহিলাদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ও তাদের স্বনির্ভর করার জন্য সুগভীর ভাবনা-চিন্তা করতো। সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগ, উদ্যম ও পরিশ্রম উজাড় করে দিতো। অনুরূপ লক্ষ্যে আত্মনিবেদিত বাংলাদেশের নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের কর্মধারা প্রত্যক্ষ করার জন্য বাংলাদেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তাঁর কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করে। স্বল্পসঞ্চয়ে মহম্মদ ইউনুস নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে কমরেড ব্যানার্জীও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল।

সর্বোপরি, তাঁর সমবায়ের কর্মকাণ্ড ছিল দেশব্যাপী। 'সমবায়রত্ন' উপাধি অর্জনের মাধ্যমে সে শুধু সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়েছিল, তা-ই নয়। চীন, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ছাড়া নরওয়েতেও গিয়েছিল। এ-সম্পর্কে বই লেখার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট উৎসাহ

ও সহযোগিতা ছিল। বিশেষ করে তার লেখা অমূল্য গ্রন্থ 'সমবায় ও মানবসভ্যতা' বইটি ইংরেজিতেও লেখার জন্য বারবার তাগাদা দিতাম, যাতে আগ্রহী অ-বঙ্গভাষীরাও তা পড়তে পারে। ইংরেজিতে প্রায় অর্ধেকটা লিখেও ফেলেছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে, বিশেষ করে দৃষ্টির অস্বচ্ছতার জন্য শেষ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

□ রাজনৈতিক কারণে অশোকদার শরীরের উপর যে দানবীয় অত্যাচার হয়েছিল, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন? তবু শেষদিন পর্যন্ত তো তিনি লক্ষ্যে অবিচলই ছিলেন, তাঁর মনোবলেও কোনো চিড় ধরেনি।

কংগ্রেসি আমলে তার উপর শারীরিক যে অত্যাচার হয়েছিল, তা সত্যিই দানবিক। কিন্তু তা তাকে বিন্দুমাত্র ভীত করতে পারেনি। তবে শারীরিক অসুস্থতাকে বাড়িয়ে তুলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দারুণ সুগার, পারকিনসন, চোখে কম দেখা ইত্যাদি অসুখ কষ্ট দিলেও সে-সব তাকে কখনো হতোদ্যম করতে পারেনি। বহুবার ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হতো, সারাদিন অনেক ওষুধ খেতো হতো। কাজে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য শুধু সিদ্ধ টিফিন দিতাম সঙ্গে। আগে-পরে নিয়ম মেনেই ওষুধ খেতো। তোতার মৃত্যুদিনে বর্ধমান শহরে থাকতে পারতাম না, বাইরে চলে যেতাম। গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বরের আগে ও বেশ অসুস্থ। আমি বললাম, এবারে আর কোথাও যাবো না, বাইরে শরীর খারাপ বাড়লে অসুবিধা হবে। শুনলো না, আগের দিন মাইথন গেলো, ১৯ তারিখ ফিরে এলাম। এই ছিল তার মানসিক দৃঢ়তা।

□ অশোক ব্যানার্জীর উজ্জ্বল জীবনের পিছনে আপনার অবদানও তো অনস্বীকার্য।

আমার অবদান কতটা ছিল তা বলতে পারবো না। তবে দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে তার অনুপস্থিতিতে আমার কোনো ক্ষোভ, অভিযোগ, অনুযোগ ছিল না। নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায়ও আমি তাকে বিব্রত হতে দিইনি। কমল গায়েনের সাহায্যে একাই সব সামলেছি। এই সময়ে আমার পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে কমরেড মদন ঘোষ ও কমরেড নিরুপম সেন-এর অবদান ছিল অনেকখানি। তাঁদের অবদান চলার পথে এগিয়ে যেতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

গত ২১ মার্চ ২০২০ আমার দীর্ঘ ৫৬ বছরের সুখী সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনে ছেদ ঘটলো। কমরেড ব্যানার্জী বলতো, "কমিউনিস্টরা কখনো একা হয় না, তুমিও হবে না। বর্ধমানের ছেলেমেয়েরা তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে, তাদের নিয়েই থাকবে।" তার এই কথাটি মনে রেখে মনকে শক্ত বাঁধনে বেঁধ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে চরম একাকীত্বের যন্ত্রণার মধ্যেই এগিয়ে চলেছি। করোনাতঙ্কও তাই আমাকে গৃহবন্দী করতে পারেনি। জানি না কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে আমার এই চলা স্তব্ধ হবে।

☐ নবীন প্রজন্মের কাছে আপনি কী বার্তা রাখতে চান?

নবীন প্রজন্মের কাছে এইটুকুই বলতে পারি—রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী, এই সত্য উপলব্ধি করে শোষণ-মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়াই যে-কোনো সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কমরেড বানার্জীর সাহচর্যে এই শিক্ষাই পেয়েছি। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারলে সামাজিক বিপর্যয় হোক, রাজনৈতিক বিপর্যয় হোক, মহামারী হোক, জয় আমাদের হবেই। দেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব, তাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠার প্রতিজ্ঞাটা থাকা দরকার।

সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামীদের কাছে আমি এই কথাই বলতে চাই, বাস্তবকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে, স্বচ্ছ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক দর্শনে আস্থাশীল থেকে দৃঢ় মনোবলে এগিয়ে যেতে পারলে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা নেই আমাদের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করার—এই বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে।

☐ ধন্যবাদ।

প্রতিবেদক : *বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী ও নতুন চিঠি-র সাংবাদিক।*

স্মৃতির দর্পণে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় আলোকিতচিত্ত, প্রকৃত অর্থেই একজন কমিউনিস্ট, রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন জনমুখী কর্মধারায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মনিবেদিত। বিশেষ করে দেশব্যাপী সমবায় ও স্বয়ম্ভর আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রপথিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের উচ্চতম পদে সগৌরবে আসীন। ভারত সরকার প্রদত্ত 'সমবায় রত্ন' উপাধি এক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদানেরই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন 'নতুন চিঠি' পত্রিকার প্রাণপুরুষ—তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, প্রকাশক ও পরবর্তীকালে গঠিত 'নতুন চিঠি ট্রাস্ট'-এর সভাপতি। শারীরিক

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াই চালিয়ে অবশেষে গত ২৯ মার্চ ৮৩ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন। শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে তাঁর নিজের দেহটিও তিনি দান করে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এই যে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে অনুরাগী জনগণের যে সমাবেশ স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল তা সম্ভব হলো না, কেননা এমন একটি দুঃসময়ে তিনি প্রয়াত হলেন যখন করোনা-আক্রান্ত দেশের সুকঠিন লকডাউন পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্বের নির্দেশনায় যে-কোনো সমাবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকৃতির সামগ্রিক আলোচনা একটি লেখায় সম্ভব নয়, সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যতটা যেভাবে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে পারি। বহুমাত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতাকে অতিক্রম করে আন্তরিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল, ব্যক্তিগত পর্যায় পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছিল পারিবারিক স্তর পর্যন্ত। তাঁর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জী ছিলেন এবং এখনও আছেন একই রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে। কন্যা তোতার অকালমৃত্যুর মর্মন্তুদ বেদনা বহন করেই বৃহত্তর সংগ্রামের পথে তাঁরা এগিয়ে গেছেন। অশোকবাবু চলে গেছেন, সেই সব-হারানোর বেদনা নিয়েও গৌরী ব্যানার্জী এখনও এগিয়ে চলেছেন সেই অঙ্গীকারবদ্ধ পথেই।

পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষকতার নানা পর্যায় পেরিয়ে ১৯৬৫ সালে আমি অধ্যাপক হিসাবে রাজ কলেজে যোগদান করি। সেই সূত্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার ক্রমবর্ধমান সংযোগ অশোকবাবুর সঙ্গে সংযোগকেও ক্রমশ প্রসারিত করেছে। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন পদস্থ কর্মী এবং কর্মী সংগঠনের সংগ্রামী নেতা। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের সূত্রে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর পশ্চাৎপটে অবশ্যই কাজ করেছে মার্কসবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঐক্যবোধ এবং সেই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ। মতাদর্শগত ঐক্যবোধে এক হলেও তার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অশোকবাবু এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে তাঁর ধারে-কাছেও যেতে পারিনি, কিন্তু শিখেছি অনেক কিছু। সাতের দশকের শুরু থেকেই দেখেছি ও শুনেছি কংগ্রেসিদের কী অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। পুলিশি অত্যাচারও কম সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু বিন্দুমাত্র আত্মসমর্পণ তিনি করেননি। অন্যদিকে ১৯৭৭-এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর ১৯৮১ সালে অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন এবং তার জেলা কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী রামনারায়ণ গোস্বামীর আপ্ত-সহায়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষমতার গর্বে কখনো তিনি বিন্দুমাত্র উচ্চমার্গীয় মনোভাবের শিকার হননি। একই রকম সরল ও সাধাসিধে জীবনযাপন করেছেন। প্রতিশোধস্পৃহার বশবর্তী হয়ে তাঁর উপর নির্মমতম আক্রমণের জবাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে

প্রত্যাঘাতের পথেও কখনো যাননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্যপদ লাভ করার পর আমারও সৌভাগ্য হয়েছে কমিটির সভায় তাঁর পাশে বসবার।

এবার 'নতুন চিঠি'-র প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই সাপ্তাহিক পত্রিকার যাত্রা শুরু। সম্পাদক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী। বামপন্থা পত্রিকার ঘোষিত নীতি, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে দায়বদ্ধ। পরিবেশনগুণে তা জনপ্রিয়। বিশেষ করে তার শারদ সংখ্যাটির মান বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯৭৮ সাল থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত হই। পত্রিকা প্রকাশের অতীত অভিজ্ঞতা আমার ছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সে অভিজ্ঞতাও ক্রমশ নতুন মাত্রা অর্জন করে। বৃহত্তর দায়িত্বের বাধ্যবাধকতায় অশোকবাবুকে যখন বেশিরভাগ সময় কোলকাতায় কাটাতে হয়, তখন সাময়িকভাবে পত্রিকা দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা নিরুপম সেন। তাঁর সঙ্গে আমিও পত্রিকার কাজে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। অবশেষে ১৯৮৯ সালে আমাকেই সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে দায়িত্ব এখনও পালন করে চলেছি। অশোকবাবু নতুন চিঠি পত্রিকা অফিসটিকে গড়ে তুলেছিলেন সুনির্দিষ্ট কর্মস্থান ছাড়াও বৃহত্তর সংযোগ ও মতবিনিময়ের একটি কেন্দ্র হিসাবে। কিছুটা আড্ডার স্থান হিসাবেও বটে। শেষের দিকে তিনি কমই আসতে পারতেন। কিন্তু নতুন চিঠি সেই ধারা এখনও বজায় রাখতে সচেষ্ট।

সবশেষে যে অসামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলবো তা কেবল অশোকবাবু ও আমার এবং তার স্থান বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস। অশোকবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 'সমবায়ের মধ্যে সমবায়' ব্যবস্থা হিসাবে স্বয়ম্ভর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। বাংলাদেশে সমবায়-ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার বিশাল কৃতিত্বের অধিকারী নোবেলজয়ী মুহম্মদ ইউনুস-এর কর্মপ্রণালী পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় অশোকবাবুর সঙ্গী হিসাবে সেখানকার রাজধানী ঢাকা শহরে যাবার এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুবিশাল বহুতল বাড়িতে মুহম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মুহম্মদ ইউনুস-এরই আত্যন্তিক সহযোগিতায় দেশের পাঁচটি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তরে গিয়ে ব্যাঙ্কগুলির কর্মপ্রণালী নিরীক্ষণে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক জান্নাত-ই-কাওনাইন—সকলের 'জান্নাত ম্যাডাম'। ব্যাঙ্ককর্মী ও পরিচালকদের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতাও ছিল তুলনাহীন। ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষে ১৯৯৯-এর ১৮ মার্চ ঢাকায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে ফিরে এসে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে আমরা মুহম্মদ ইউনুস-এর মুখোমুখি হলাম। পনোরো মিনিটের নির্ধারিত সময় কখন এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। অন্য জরুরি আহ্বানে দু-একবার স্বল্পকালের জন্য উঠে যেতে হলেও পরমাগ্রহে তিনি আবার ফিরে এসে বসেছেন। এ স্মৃতি ভোলার নয়। ভোলার নয় আর একটি স্মৃতিও। যেটি হলো বর্ধমানের গর্ব সৈয়দ শাহেদুল্লাহর

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা ও মধ্যাহ্নভোজন।

এর পর ঢাকা থেকে আমরা রওনা দিলাম বরিশালের দিকে। অনুরোধটা ছিল আমার, যা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন অশোকবাবু। অনুরোধের কারণ বরিশালের চাঁদসি গ্রাম ছিল আমাদের আদি নিবাস, যদিও দেশভাগের সময় পিতার কর্মসূত্রে আমরা রংপুরে থাকায় সেখান থেকেই বাস্তুহারা হয়ে চলে এসেছিলাম জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার শহরে, যেখানে আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সে অন্য কথা। কিন্তু এত ছোট বয়সে আমাকে বরিশাল ছেড়ে যেতে হয়েছিল যে এই বিরল সুযোগে আমাদের সেই আদি নিবাসকে ফিরে দেখবার এক গভীর আগ্রহ মনের ভিতরে কাজ করছিল। অশোকবাবু তা জানতেন এবং ঢাকা শহর থেকে যথেষ্ট দূরে হলেও বরিশাল যাওয়াটা বাংলাদেশ ভ্রমণের কর্মসূচির মধ্যেই রেখেছিলেন। স্টিমারে চেপে বিশাল নদী পেরিয়ে স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রাশেষে চাঁদসিতে পদার্পণ। পিতৃপরিচয়ে আমার উপস্থিতি এলাকায় সাড়া ফেলে দিল। অভাবিত আন্তরিকতায় এলাকার মানুষজন প্রায় মিছিলের আকারে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমার পৈত্রিক নিবাস সহ সারা এলাকা ঘুরিয়ে দেখালো। জাতি-ধর্ম বোধের ঊর্ধ্বে সে এমন এক অভাবিত অভিজ্ঞতা যা অশোকবাবুকেও মুগ্ধ করেছিল। পরেও বহুবার তিনি সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

মুহম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি আমরা নিয়েছিলাম, তার পূর্ণ বয়ান মুদ্রিত হয়েছিল ২০০৭ সালে কলকাতা বইমেলায় 'নতুন চিঠি প্রকাশনা' কর্তৃক প্রকাশিত অশোকবাবুর 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' নামক পুস্তকে। এর আগে ২০০২ সালের কলকাতা বইমেলায়ও অশোকবাবুর লেখা 'স্বয়ম্ভরতা ও সমবায়ে পেশাদারিত্ব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল 'নতুন চিঠি প্রকাশনা'। এ-ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলায়। প্রকাশক 'ফেডারেশন অব ওয়েস্টবেঙ্গল আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড'। গ্রন্থটির প্রাক্‌কথনে তিনি গ্রন্থটি রচনায় নতুন চিঠি পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমার যে বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তা তাঁরই মহানুভবতার প্রকাশ এবং আমার পক্ষে অবশ্যই গর্বের।

সময় অশোকবাবুকে ভুলবে না।

লেখক : *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও 'নতুন চিঠি'-র সম্পাদক।*

'হে সখা মম হৃদয়ে রহ'

মৃদুল সেন

গত ২৯ মার্চ আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, বন্ধু, ভাই, পরম সুহৃদ কমরেড অশোক ব্যানার্জী চলে গেলেন। শুধু কমরেড বললে কথাটা অসম্পূর্ণ হয়—অশোক আমার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি। আমার আর আমার স্ত্রী স্বপ্নার জীবনে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জী অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান।

সেই কবেকার কথা। ১৯৬২ সালে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। কর্মচারীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার সংগ্রাম শুরু হল—শুরু হল নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন। যাতে কোনোভাবেই চাকুরিচ্ছেদ না হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজন সংগঠন গড়ার। ১৯৬৪ সালে গঠিত হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি। দেরি না করে কলকাতায় গিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নিলাম। এবার পাকাপোক্ত ভিতের উপর গড়ে উঠল কর্মচারী সংগঠন।

১৯৬৬ সাল—সারা বাংলা জুড়ে গণআন্দোলনের জোয়ার। সেই ঢেউ উত্তাল তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ল শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনগুলির উপর। গড়ে উঠল '১২ই জুলাই কমিটি'—শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ।

'৬৬-র ১২ই জুলাই কমিটির মিছিল ভুলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা রাস্তায় মিছিলে হাঁটা বা শ্লোগান দেওয়ায় অভ্যস্ত নয়। আমি একাই শ্লোগান। তুললাম—কর্মীরা সাড়া দিল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে সিপিআই(এম) পার্টির নেতারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। পরিচিত হলাম সুশীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

এমন সময় ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি একদিন মিছিলে এক নতুন মুখ দেখলাম। ভালো শ্লোগান দেয়। মধুসূদন ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলাম—"ছেলেটি কে?" মধুসূদন ব্যানার্জী জানালেন "ওর নাম অশোক ব্যানার্জী—ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে নতুন জয়েন করেছে।" মধু ব্যানার্জীকে বললাম—"ওকে ধরুন, ইউনিয়নের কাজে ওকে যুক্ত করতে হবে। বেশ সম্ভাবনাময় ছেলেটি।" সেই প্রথম আলাপ, বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীকালে একান্ত আপনজন ও সুহৃদ।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। আমাদের কাজকর্মের পরিধিও আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকল না। আমি, অমল

ব্যানার্জী ও অশোক ব্যানার্জী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে এই 'ত্রয়ীর' কিছুটা পরিচিতি ছিল। এই সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করার একটা বিশেষ সুযোগ এসে গেল। সলিল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য "ম্যাক্সিম গোর্কী শতবর্ষ' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ১৯৬৭-তে আমার তখনকার বাসস্থান শূলীপুকুর মেসে আমাদের নিয়ে স্বপ্না, মনোরম সেন, আদিত্য ও আরও কয়েকজন পার্টি-ঘনিষ্ঠ ও দরদীদের নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতেই বর্ধমান শহরে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল—জন্ম নিল 'অন্বেষা'—শহরের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার। এই 'অন্বেষা'র নামানুসারেই অশোক ব্যানার্জী তাঁর মেয়ের নাম রাখেন অন্বেষা। ১৯৬৮ সালে 'টাউন হল' ময়দানে 'গোর্কী শতবর্ষ' কমিটির উদ্যোগে সেমিনার, নাটক দিয়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপন হল। আমরা মঞ্চস্থ করলাম অমল ব্যানার্জীর পরিচালনায় 'নীচের মহল' নাটকটি। মঞ্চ উপস্থাপনায় অসাধারণ সাফল্যে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করলাম।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের প্রথম সিপিআই(এম) পার্টি শাখা তৈরি হয়। আমরা চারজন। অমল ব্যানার্জী, মধুসূদন ব্যানার্জী, এস.এম. আসগার ও আমি হলাম এর সদস্য। অশোক ব্যানার্জীও ওই বছরেই এই ব্রাঞ্চে যুক্ত হয়—ফলে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়।

এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে জমির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকার কারণে এই লড়াই ভিন্নতর মাত্রা পায়। সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে আমাদেরও দায়-দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেল। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত নাটক যেমন 'রক্তে রোয়া ধান', 'জোট বাঁধো তৈরী হও', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' প্রভৃতি নাটক ও গণসঙ্গীতের ডালি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এই সংগ্রামের পাশে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না- কোনো গ্রাম থেকে বা সম্মেলন থেকে ডাক পেতাম অনুষ্ঠান করার জন্য। 'হারানের নাতজামাই' নাটকটি করার সময় 'ময়না' চরিত্র করার জন্য মহিলা অভিনেত্রী পাওয়ার একটা সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধান করে অশোক ব্যানার্জী ওর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জীকে অভিনয় করার জন্য নিয়ে এসে। ওর মেয়ে তোতা তখন নিতান্তই শিশু। ওকে নিয়েই নিয়মিত রিহার্সালে আসত ওরা দুজন। ঘুমিয়ে পড়ত তোতা। 'হারানের নাতজামাই' নাটকটি করার সময় আমরা একবার একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। কুসুমগ্রামে নাটকটি করতে গেছি—ওইদিনই চৈতন্যপুরের জমিদারদের আন্দোলনরত কৃষকদের উপর গুলি চালানায় কয়েকজন (খুব সম্ভবত ৫ জন) কৃষকের মৃত্যু হয়। পরদিন সারা বাংলা গর্জে ওঠে এই হত্যার প্রতিবাদে এবং হরতাল পালন করে। আমাদের বাসও আর বর্ধমান ফিরতে পারে না—কুড়মুনে এসে আমরা আটকে পড়ি। ওই গ্রামে বসবাসকারী পার্টিনেতা দেবব্রত দত্ত তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গিয়ে থাকার

বন্দোবস্ত করেন। বিকেলে আমরা কুড়মুনের কৃষকদের সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হলাম এবং সন্ধ্যায় মিছিল শেষে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দাওয়ায় বিনা মাইকে ৪টি হ্যাজাকের আলোয় আমাদের নাটক 'হারানের নাতজামাই' পরিবেশন করলাম। নাটকটি জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল— পুলিশবেশী আমাকে প্রায় তাড়া করে কয়েকজন। বড়শুলে সারা ভারত কৃষকসভার প্রকাশ্য সমাবেশে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলে কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং বিনয় কোঙারের আনুকূল্যে আমরা কৃষকসভার পক্ষ থেকে একটি দামি হারমোনিয়াম উপহার পেলাম, যেটির অভাব আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ছিল।

'অন্বেষা'র নাটক ও গণসঙ্গীত রিহার্সাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ঘরের। টাউন কমিটির সেক্রেটারি সুশীল ভট্টাচার্য টাউন কমিটি অফিসের একটি ঘর আমাদের সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। শুরু হল গান ও নাটকের নিত্যচর্চা। অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। এলেন অত্যন্ত সুকণ্ঠ ও শক্তিশালী অভিনেতা আনোয়ার হোসেন। রূপমহল সিনেমা ও বর্ধমান সিনেমার মাঝখানের গলিতে ছিল টাউন কমিটির অফিস। প্রতিদিন জমায়েত হতাম রিহার্সাল কক্ষে—মহরা চলত। সুশীলদা অফিস বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—এ ছিল এক অভ্যস্ত জীবন।

নাটকের প্রতি অশোক ব্যানার্জীর ছিল অপরিসীম আকর্ষণ। নাটকে অভিনয়ের প্রতিও ছিল অসম্ভব দুর্বলতা। একটি মজার ঘটনার কথা বলি। 'মারীচ সংবাদ' নাটকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পিতার একটি নেপথ্য ডায়ালগ ছিল। অশোক ব্যানার্জী বলল 'আমি স্টেজে উঠব।' আমি বললাম—'কোন অবকাশ নেই।' নাটকের দিন রবীন্দ্রভবনে নাটক চলাকালীন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—ঈশ্বরের স্বর্গীয় পিতার ডায়ালগ

নেপথ্যে ভেসে ওঠার সময় মঞ্চের ব্র্যাক ড্রপসিনের মাঝখানটা ফাঁক করে অশোক ব্যানার্জীর মুখ দেখা গেল ঈশ্বরের পিতা হিসাবে অবতীর্ণ হতে। যা ছিল নেপথ্যে, ওর কল্যাণে তাই হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ। হারানের নাতজামাই নাটকে নাতজামাইয়ের ভূমিকায় অশোক ব্যানার্জীর অভিনয় এক বিশেষ মাত্রা পায় গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে। পুলিশের তাড়া খাওয়া আত্মগোপন করা এক বলিষ্ঠ চরিত্র কৃষকের ভূমিকায় ওর অভিনয় করা চরিত্রের সঙ্গে দর্শকেরা একাত্ম হয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যস্ত থাকলেও কোনো নাটক আমরা করতে গেলেই শত ব্যস্ততার মধ্যেও অশোক ব্যানার্জী হাজির হতো অংশগ্রহণের জন্য। আমাদের 'দেনা পাওনা' নাটকে (যেটির প্রায় ৫০টি প্রদর্শন হয়েছিল) একটি ছোট্ট চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করতে সোৎসাহে উপস্থিত হতো এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সেখানেও দর্শকের মন জয় করে নিত।

এভাবেই সাংস্কৃতিক কাজকর্মের পাশাপাশি আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললাম। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে কৃষক-আন্দোলন ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রবল গণসংগ্রামে শাসক শ্রেণীর ভিত কেঁপে উঠল। তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নিজ সরকারকে 'অসভ্য-বর্বরদের সরকার' বলে আখ্যায়িত করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হতে চলেছে। ১৬ মার্চ ১৯৭১ প্রমোদ দাশগুপ্ত ডাক দিলেন ব্রিগেড জমায়েতের—আমরা অশোক ব্যানার্জী সহ কর্মচারী বন্ধুরা মিছিল করে সেই জমায়েতে হাজির ছিলাম। প্রমোদ দাশগুপ্ত নির্দেশ দিলেন পরিষ্কার ভাষায়—"যে মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে সেই মুহূর্তেই এর বিরুদ্ধে রাজ্য অচল করে দিতে হবে।" জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। সিদ্ধার্থশংকর রায়কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। ১৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হরতাল ডাকা হল, আমরাও সেই হরতালে শামিল হলাম। আমাদের বেশ কয়েকজনকে সাঁইবাড়ি হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হল। অকিঞ্চন ব্যানার্জীর কোয়ার্টারে আত্মগোপন করে থাকার সময় পার্টির নির্দেশ এল বর্ধমান শহর ত্যাগ করার। আমি অশোক ব্যানার্জীকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বর্ধমান শহর ত্যাগ করলাম। কিন্তু যারা আমাদের ইউনিয়ন দখল করতে চাইছে তারা থামবে কেন। কিছুদিনের মধ্যেই অশোক ব্যানার্জীকে গুণমণি হত্যা মামলায় জুড়ে দেওয়া হল। ফলে অশোক ব্যানার্জীও বর্ধমান শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গোপন আস্তানায় গিয়ে উঠল, কিন্তু বেশিদিন আত্মগোপন করে ও থাকতে পারল না। কংগ্রেসীদের চক্রান্তে ধরা পড়ে—চলল পুলিশ ও কংগ্রেসী মস্তানদের ওর উপর অমানুষিক অত্যাচার। ওর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হল, ব্রিটিশ কায়দায় ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের নীচে আঘাত করে স্নায়ুগুলোকে জর্জরিত করা হল—যা অশোক ব্যানার্জীর শেষ জীবন পর্যন্ত তার শারীরিক অসুস্থতার প্রধান কারণ। এমনকি ওই সময়ে পুলিশী অত্যাচারের ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে

হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় ভর্তি থাকার সময়েও ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করার পরিকল্পনা গুণ্ডারা করে—যদিও পার্টির সতর্কতায় তা সফল হয়নি।

ওই সময়ে আমি কলকাতায় গণশক্তি প্রেসে চলে গেলাম। আমার উপর সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও প্রমোদ দাশগুপ্ত ঝুঁকি নিয়েই আমাকে গণশক্তি প্রেসের রোটারী মেশিনের দায়িত্ব দিলেন। একসময়ে অশোক ব্যানার্জী 'গুণমণি হত্যা মামলায়' বেকসুর মুক্তি পেল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে একদিন হাজির গণশক্তি প্রেসে। আবার যোগাযোগ হল বন্ধুর সাথে। পার্টির কাজ নিয়ে যখনই কলকাতায় আসত আমরা একসঙ্গে বসে পার্টিসংক্রান্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা, বর্ধমান শহরের অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনায় কত সময় কাটিয়েছি। আবার ওর মধ্যেই আমরা সিনেমাও দেখেছি। নাটকের প্রতি ওর প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকায় থিয়েটারও দেখতে গেছি আমি, অশোক ব্যানার্জী, গৌরী ব্যানার্জী ও স্বপ্না। কলকাতার দমদমে ও আমাদের বাড়িতেও যেত আমার সঙ্গে ওই সময়কালে।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থাকালীন ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলাম—ঠাঁই হলো প্রেসিডেন্সি জেলে। স্বভাবতই অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ আবার ছিন্ন হল।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে বামফ্রন্ট ফিরে এলে আমিও বর্ধমানে ফিরে এলাম। কলকাতায় যেদিন বামফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে সেদিনটিতেই আমি ও অশোক ব্যানার্জী আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে এলাম। কর্মচারীদের বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ভয়-ভীতি কাটিয়ে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানালো আমাদের। আবার আমরা কর্মচারী সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কর্মচারী আন্দোলনে এল নতুন জোয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু অশোক ব্যানার্জী বেশিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকল না। দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে রামনারায়ণ গোস্বামী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হলে উনি অশোক ব্যানার্জীকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োগ করলেন।

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ এ্যাক্ট হিসাবে কোর্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হল। কোর্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অশোক ব্যানার্জীকে ফিরিয়ে আনা হল। বিপুল ভোটে জয়লাভ করে অশোক ব্যানার্জী। আমিও জয়লাভ করি এবং জেলা সম্পাদক রবীন সেন-এর নির্দেশে কাউন্সিল সদস্য হিসাবে আমাকেই মনোনীত করা হল। আবারও অশোক ব্যানার্জী খুব বেশিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকল না।

এক সময় অশোক আমাকে জানায় যে পার্টি পূর্বতন সাপ্তাহিক 'নতুন পত্রিকা' আবার নবকলেবরে 'নতুন চিঠি' নাম নিয়ে প্রকাশ করতে চলেছে এবং তার দায়িত্বে থাকবে অশোক ব্যানার্জী। গণশক্তি পত্রিকা ও প্রেসে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় ও আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশে ওকে

সর্বতোভাবে সাহায্য করি—বন্ধুর অনুরোধ রাখলাম এবং বেশ কিছুদিন ওই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলাম।

এর পরেই অশোক ব্যানার্জী সমবায় আন্দোলনের একজন অগ্রণী পথিক ও নেতা হিসাবে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সারা দেশেই সমবায় আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয় অশোক ব্যানার্জী। সর্বভারতীয় সমবায় আন্দোলনে অশোক ব্যানার্জী সর্বশ্রেষ্ঠ সমবায়ী ব্যক্তি ও সংগঠক হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করে যা আমাকে বন্ধু হিসাবে গর্বিত করে। মনে পড়ে আমার সপরিবারে কেরালা ভ্রমণের সময়ও ত্রিবান্দ্রমে আমাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার অনুরোধ করে ওখানকার সমবায় কর্তাদের। রেলওয়ে স্টেশনে ওইসব কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে আমাদের সাদরে কো-অপারেটিভ গেস্টহাউসে নিয়ে যান এবং আমাদের থাকা-খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা করেন। ওই সময় দেখেছি কেরালার সমবায়ী কর্তারা অশোক ব্যানার্জী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত এবং সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর থেকেই বোঝা যায় সর্বভারতীয় সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ওর অসামান্য ভূমিকা ও জনপ্রিয়তা।

অশোক ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে অনেকেই লিখেছেন—আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমাদের দুটি পরিবারের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব তা কখনোই ভুলতে পারবো না। মনে পড়ে ওর মেয়ে তোতার প্রথমবার বিয়ে নিয়ে কথা বলতে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জী আমাদের বাড়িতে আসে। তখন আমি এই বিয়েতে সায় দিতে পারিনি। অন্য সম্প্রদায় বা ধর্মের কারণে নয়, ছেলেটির ব্যক্তিগত জীবনশৈলী বিষয়ে অনেক খবর জানি বলেই আমি অশোক ব্যানার্জীকে বলেছিলাম এ বিয়েতে তোতা সুখী হতে পারবে না বলেই আমার ধারণা। সেদিন আমি গৌরী ব্যানার্জীর চোখে জল দেখেছিলাম। তোতা পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরবর্তীতে অশোক ব্যানার্জীর আপত্তি ও অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং বিভাগে ওকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করলাম। তোতাও যেন নতুনভাবে বাঁচার রসদ পেল—আবার গ্রুপ থিয়েটারে যোগদান করলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের নাট্যাভিনয়ে ও যোগ দিয়েছে এবং একজন সুঅভিনেত্রী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমার মেয়েকে অশোক ব্যানার্জী ডাকতো 'মেমসাহেব' বলে। আমার মেয়ে বর্ধমানে এলেই অশোক ব্যানার্জীও যেমন আমার বাড়ি আসত, তেমনি আমিও যেতাম ওর বাড়ি আমার নাতনী সহ। আমার নাতনী এলেই অশোক ব্যানার্জী ওর সঙ্গে নানারকম গল্প করে জমিয়ে রাখতো। কর্মোপলক্ষে ব্যাঙ্গালোর গিয়ে আমার মেয়ের বাড়িতেও অশোক ব্যানার্জী গিয়েছিল। এমনিতে রিক্সা নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতো সুযোগ পেলেই। আমরাও ওর বাড়ি যেতাম—নানান বিষয়ে আলোচনা হতো, আবার মতপার্থক্যও হতো, কিন্তু মনান্তর

কখনোই হতো না। জ্যোতি বসুর প্রধামন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার তীব্র মতপার্থক্য হল—ও বিপক্ষে ক্ষার আমি পক্ষে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা হল অন্যান্য বিষয়ে।

তোতার অকালমৃত্যু অশোক ব্যানার্জীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে স্বভাবতই ভয়ানক বিপর্যস্ত করে। সুগার ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাও বাড়তে থাকে। নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের নিয়মানুবর্তী থাকলেও ক্রমাগত শরীর ভাঙছিল। নিজের বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত যখন নিল আমি প্রাথমিকভাবে সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু যখন বলল যে ও ওষুধের টাকা যোগাড় করতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু বলার জায়গা ছিল না। ভাড়াবাড়ি অরুণ রায় (ভূতি)-র বাড়িতে চলে এল। ওরা সাদরে অশোক ব্যানার্জী ও গৌরী ব্যানার্জীকে একেবারে আপন করে নিল, দেখভাল করার ব্যবস্থা করল।

নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও বাড়ি বিক্রির টাকা থেকেই পার্টি ফাণ্ডে এবং সেবাসমিতির ফান্ডে অর্থ প্রদান করে—যেটা অশোক ব্যানার্জী বলেই সম্ভব। পার্টির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, মমত্ব ও দায়বদ্ধতার যে পরিচয় অশোক ব্যানার্জী দিয়েছে তা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। এপ্রসঙ্গে গৌরী ব্যানার্জীর অবদানও কম নয়। অশোক ব্যানার্জীর যোগ্য জীবনসঙ্গী গৌরী ব্যানার্জী, যার অবদান অশোক ব্যানার্জীর জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে।

আফশোস রয়ে গেল, অন্তিমকালে করোনার আবহে লকডাউনের জন্য আমার বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা হল না। বিদায় বন্ধু—লাল সেলাম। বলি—'হে সখা মম হৃদয়ে রহ'।

লেখক : *বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর সহকর্মী ও বন্ধু।*

কমরেড অশোক ব্যানার্জী—কমিউনিস্ট মূল্যবোধে লালিত এক সংগ্রামী জীবন

সেখ সাইদুল হক

২৯ মার্চ ২০২০ বেলা ১১.৩০ নাগাদ সিপিআই(এম)-এর জেলা অফিস হতে ফোনে জানলাম আমাদের প্রিয় অশোকদা, কমরেড অশোক ব্যানার্জী আর নেই। মানসিক প্রস্তুতি ছিল। গত ২১ মার্চ গিয়েছিলাম ওনাকে দেখতে। তখনই খুব অসুস্থ। ওনার সহযোদ্ধা ও সহধর্মিণী গৌরীদি ছিলেন। কথা হল। শেষ কয়েকবছর নানা রোগে ভুগছিলেন। তবু নিয়মিত পার্টি কর্মসূচিগুলিতে থাকার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে ৮৩ বছর বয়সে নার্সিংহোমেই প্রয়াত হলেন। এক দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান হল। মৃত্যুর খবর শুনেই নার্সিং হোমে পৌঁছে গেলাম। করোনা সতর্কতা ও লকডাউন বিধি মেনে মরদেহ জেলা অফিসে আনা হল। সেখান হতে মেডিকেল কলেজে দেহ দান।

অশোকদা মানেই সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। পার্টির মধ্যে এমন বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁদের দেখে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়। এই কারণে নয় যে তাঁরা মার্কসবাদে সুপণ্ডিত বা উচ্চ ডিগ্রিধারী কিংবা পার্টির বা প্রশাসনের উচ্চপদে আছেন। হয় এই কারণে যে তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা, সরল অনাড়ম্বর জীবন, কমিউনিস্ট মূল্যবোধ তাঁদেরকে নেতা হিসাবে নয়, পার্টির পরিধির বাইরেও মানুষজনের কাছে আপনজন করে তোলে। অশোকদা কমরেড অশোক ব্যানার্জী, তেমনই একজন।

কৃষক ও গণ আন্দোলনের ধারায় :

শুধু রাজ্যে নয় সারা দেশে সমবায় আন্দোলন ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে অশোক ব্যানার্জী একটি অতি পরিচিত নাম। কিন্তু সমবায় আন্দোলনে সাফল্য ও সার্থকতায় পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলন ও গণআন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ যে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করেছে সেটাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখতে হবে। আর এখানেই অশোকদার সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতা। প্রাদেশিক কৃষকসভা, জেলা কৃষকসভার সদস্য হিসাবে অশোকদা যোগ্যতার সাথে সে কাজ করে গেছেন।

১৯৩৮ সালে কালনাতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পিতা বাসা বাঁধেন মেমারি-২-এর শ্রীধরপুরে। সেখানে প্রাথমিক পড়াশুনা। পরে ভাতার স্কুলে, তারপর

সিউড়ি কলেজ এবং পরে রাজ কলেজে পড়াশুনা সাঙ্গ করে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে বর্ধমান শহর লাগোয়া সদরের রায়ান হাইস্কুলে শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সালে গৌরীদি-র সাথে বিয়ে। গলসী গার্লস হাইস্কুলের দিদিমণি। শহরের পারাপুকুরে তাঁরা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। ওই সময়ই ১৯৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলনে, শিক্ষক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন রায়ানের প্রিয় মাস্টারমশায় অশোকদা। নজরে পড়েন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম সৈনিক এবং সেই সময়ের বর্ধমানের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা কমরেড সুবোধ চৌধুরীর। অশোকদা রায়ান হাইস্কুলের চাকরি ছেড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী রূপে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ সালে পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি যুক্ত হন বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্মচারী আন্দোলনে। তিনি ছিলেন ভালো সাংস্কৃতিক কর্মা। 'অন্বেষা নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হলে তিনি ও গৌরী ব্যানার্জী তাতে যোগ দেন। কন্যার নাম রাখেন অন্বেষা। কিন্ত অশোক ব্যানার্জী এখানোই থেমে থাকেননি। ঝাঁপিয়ে পড়েন জমির আন্দোলনে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের আহ্বানে খাস জমি, বেনামি জমি দখলের আন্দোলনে গোটা বাংলা আলোড়িত। কমরেড অশোকদাও শহর লাগোয়া সদরের গ্রামগুলিতে, বিশেষ করে সরাইটিকর অঞ্চলে এবং পরে রায়ান মীর্জাপুর অঞ্চলে জমির আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হলেন। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেবার পর দখলীকৃত জমি যাতে জোতদাররা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন ঐ এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়। সেই সময় মীর্জাপুরের অবনী দত্ত রেল কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তাঁর এক ভাই ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। হটুদেওয়ানে থাকতেন। সেই বাড়িতে অশোকদা কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে রায়ানে জমির আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ওই অবস্থায় ১৯৭১ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডা ও পুলিশ বাহিনীর তাড়া খেয়ে রায়ানের মাঠে তিনি ধরা পড়েন। রায়ান গ্রামের কেষ্ট চ্যাটার্জী ও পূর্ণ মালিকও ওই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অশোকদা ধরা পড়লে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করে। হাত পা ভেঙে দেয়। ওই অবস্থায় তাঁকে

কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পান। তিনি মুক্তি পেলেও আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের জন্য এলাকায় থাকতে পারেননি। আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। বর্ধমান জেলা কৃষকসভার উদ্যোগে নতুন চিঠির প্রকাশনায় জ্যোতির্ময় স্যারের সম্পাদনায় কৃষকসভার ৬০ বছর উপলক্ষে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় সেখানে রামনারায়ণ গোস্বামীর জমির আন্দোলনের উল্লেখ আছে।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান ঘটলে এবং বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে তিনি আবার প্রকাশ্যে পার্টির কাজ শুরু করেন। কমরেড বিনয় চৌধুরী এবং কমরেড বিনয় কোঙারের পরামর্শে কৃষক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলন বিকাশে মনোনিবেশ করেন।

সমবায় আন্দোলনের ময়দানে :

অশোকদার সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরপুর প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। যাতে ওই সমবায় সমিতি প্রকৃত অর্থে কৃষকের বন্ধু হিসাবে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে তার জন্য তিনি ওই সমবায়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করেন। আলু-প্রধান এই এলাকায় কৃষকের স্বার্থে ওই সমবায়ের অধীনে হিমঘর গড়ে তোলেন। পরে তাঁর কাজের পরিধি জেলা জুড়ে বিস্তৃত হয় যখন তিনি ১৯৮৫ সালে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান হন। কমরেড রামনারায়ণদা স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হলে তিনি কিছু দিন তাঁর আপ্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। তারপর আবার সমবায় আন্দোলনের বিকাশে ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে রাজ্য জুড়ে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এর আগেই তিনি ১৯৮১ সালে জেলা পার্টির সদস্য হন। এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেন। নিজেকে কৃষক ও সমবায় আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত করেন। পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন অথাৎ সমবায়ের মধ্যে সমবায় গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সূচনা তাঁরই ভাবনাপ্রসূত। রাজ্যে গ্রামীণ কৃষি সমবায়ের সদস্যপদের জন্য সার্বজনীন সদস্যপদের ধারণা তিনি নিয়ে এসে তা কার্যকরী করেন। সমবায় আন্দোলনের সূত্রে ১৯৯৭ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ সমবায়ী মনোনীত হন এবং পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্য ৫০ হাজার টাকা সমবায় আন্দোলনের বিকাশে দান করেন। এরপর তিনি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেন। সমবায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে ভারত সরকারের বিখ্যাত ইফকো সংস্থা তাঁকে 'সমবায়রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাজের জন্য তিনি এশিয়ার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সচিব পদ লাভ করেন। ভারত সরকার ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা গড়ার জন্য যে বৈদ্যনাথন কমিটি গঠন করে তিনি তাঁর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে যে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস লিমিটেড আছে তারও তিনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সমবায় সমিতি আইন সংস্কার করে সেখানেও তিনি সদস্য হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকারের আমলে যেভাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল, যেভাবে সমবায় সমিতিগুলি দুর্নীতিতে ভরে যাচ্ছিল বা উঠে যাচ্ছিল তাতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সাথে সমবায় বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২০১২ সালে গঠিত ওই মঞ্চের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রথম সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

সমবায় আন্দোলনের বিকাশে বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব সংকল্প পিপলস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি গঠন করে। এখানেও অশোকদা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বর্ধমানের 'জাগরী' ভবনে অবস্থিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাঁরই নেতৃত্বে নাবার্ডের সহযোগিতায় সালানপুর ব্লকে জল বিভাজিকা প্রকল্প, বর্ধমান সদরের সাধনপুরে বায়োটেক ভবন নির্মাণ করে, যেখানে 'নাইট্রোফক্স' নামে জীবাণুসার তৈরি করা হয়। তিনি জৈব সারের ব্যবহার এবং 'শ্রী পদ্ধতি'তে ধান চাষে জোর দেন। তাঁরই উদ্যোগে কাঁকসা এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বিকল্প'কে সাথী করে 'সংকল্প' সংস্থা কাঁকসার রঘুনাথপুরে রুরাল টেকনোলজি প্রকল্প তৈরি করে, যেখানে ভেষজ আবীরের রঙ, মিহিদানার রঙ তৈরি করা হতো। পরিবর্তনের এই জামানায় তা এখন ভেঙে পড়েছে। মেমারি-২ ব্লকের সাতগাছিয়ার গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তিনি সেখানে শ্রীধরপুর সমবায়কে কেন্দ্র করে সর্বাত্মক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন, সেখানে একদিকে বীজ-গ্রাম গঠন করেন, পাশাপাশি ওই এলাকার কৃষক খেতমজুরদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর জোর দেন। সমবায় আন্দোলনকে এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের আন্দোলনকে বিকশিত করার সাথে সাথে জেলার গণআন্দোলন পরিচালনাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই কাজে তাঁকে অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করেন। তবে দুজনের কথা উল্লেখ করতেই হয়। একজন শহিদ কমরেড কমল গায়েন এবং অপরজন তাঁর সহযোদ্ধা ও সহধর্মিণী কমরেড গৌরী ব্যানার্জী। ১৯৬৪ সালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার পর গৌরীদি শিক্ষকতার পাশাপাশি নাটক, যাত্রা, এসবে যুক্ত ছিলেন। তারপর যুক্ত হন মহিলা আন্দোলনে। ১৯৭১ সালে পার্টি সদস্য হন। দুজনেই বহু আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তথাপি তাঁদের মনোবল ভাঙেনি। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গৌরীদি অশোকদার যোগ্য সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। আজও তিনি পার্টির জেলা কমিটির সদস্যা।

মানুষ হিসাবে :

আজীবন কমিউনিস্ট আদর্শে লালিত অশোকদা মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন এই প্রশ্নের একটাই উত্তর পেতে পারে, যেমন একজন কমিউনিস্টের হওয়া উচিত। কিন্তু সে

প্রশ্নে না গিয়েও এটা বলা যায় অশোকদার মধ্যে যেটা দেখেছি তা হলো ইজি অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ যে-কোনো সময় কাছে গিয়ে প্রাসঙ্গিক–অপ্রাসঙ্গিক দুচার কথা বলা যায়। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তবে এমন নয় শুনে চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকতেন। দুচারটা মতামতও দিতেন। কোনো কাজ পছন্দ না হলে যেমন সাংগঠনিক সভার মিটিং-এ বলতেন, তেমনি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তা উল্লেখ করে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতেন। কোনো বিষয়ে ত্রুটি হয়েছে বুঝলে অকপটে তা স্বীকার করতেন। মুখের উপর স্পষ্ট বলার অভ্যাস তাঁর ছিল। শুনেছি জ্যোতিবাবু তাঁকে আবাসন বোর্ডের দায়িত্ব নিতে বললে তিনি জ্যোতিবাবুর সামনেই বলেছিলেন, একটা শর্ত যদি মানেন তবেই দায়িত্ব নেব। শর্ত ছিল চেয়ারম্যানের কোনো কোটা থাকবে না। জ্যোতিবাবু মেনে নিয়েছিলেন। সমবায় প্রশাসন এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে পারেননি। মানুষ হিসাবে তাঁর আরও যে গুণ ছিল তা হল কলকাতায় চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো কমরেড সাহায্য চাইলে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। বাড়িতে দেখা করতে গেলে খুবই আন্তরিকতা দেখাতেন।

আমাদের গলসীতে গৌরীদির শিক্ষকতার সূত্রে অশোকদারা এক-দেড় বছর বাস করেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি থাকলেও কাজের সুযোগ সেভাবে ছিল না। বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান হিসাবে এবং পরে সাংসদ হিসাবে কাজ করার সময় আমার কাজের পরিধি একটু বিস্তৃত হলো। ওই সময় ওনার একই ওয়ার্ডে (২ নং ওয়ার্ড) বর্ধমান শহরে আমি ২০০০ সাল থেকে বসবাস শুরু করলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হবার কিছু সুযোগ পেলাম। টুকরো সেই স্মৃতিগুলিই এখন ভেসে উঠছে।

টুকরো কিছু স্মৃতি :

আমি ও শিবুদা (শিবশংকর কোঙার) সকালে গোলাপবাগ পর্যন্ত হাঁটতে যাই। অশোকদাও মাঝে মধ্যেই ছড়ি হাতে যেতেন। একদিন ধরে বললেন নতুন চিঠিকে বাঁচাতে হবে, প্রচার বাড়াতে হবে। কিছু অর্থ তুলতে হবে। নিজেও কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। নতুন চিঠি-র প্রতি অশোকদার আলাদা আবেগ ছিল। ১৯৭৭ সাল হতে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তারপর প্রকাশক। আমার লেখার ব্যাপারে সাধারণভাবে দিনেশ বলে। কোন কোন বিষয়ে অশোকদাও বলতেন। আমি খুব গর্বিত যে, ২০১৭ সালে নতুন চিঠির প্রকাশনায় শিক্ষার ওপর আমার যে বইটি (শিক্ষার চালচিত্র : ভাবনা ও দুর্ভাবনা) প্রকাশিত হয় তার প্রকাশক ছিলেন অশোকদা। নতুন চিঠি প্রকাশনা হতেও অশোকদার দুটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। একটি হল 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' অপরটি হল 'সমবায় ও স্বনির্ভরতা'।

নির্বাচনী সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে অশোকদা খুব যত্নশীল ছিলেন এবং হাতে কলমে কাজ করতেন। ২০০৯ সালে তখন আমি লোকসভার প্রার্থী। মন্তেশ্বরের মাঝেরগ্রাম পার্টি অফিসে তিন-চার রাত থাকতে হয়েছিল। দেখলাম অশোকদাও

নির্বাচনী প্রচারে ওখানে আছেন। বুথ ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে বলে দিতেন কোথায় কী অবস্থা। কী করা দরকার। ওখানকার কয়েকটি গ্রামে আমরা দুর্বল ছিলাম। উনি কমরেডদের বলতেন, তোমরা যাও তালাই পেতে বসে থাকে। একদিন না একদিন দু-চারজন করে ঠিকই আসবে।

বর্ধমানের জাগরীতে গত বছর সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উপর রাজ্য কর্মশালা হলো। অশোকদা অসুস্থ শরীরে সারাদিন রইলেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনলেন। সমবায় বাঁচাও আন্দোলনে জেলাগুলিতে যারা কাজ করছেন তাঁদের অনেককে চিনতেন। তাঁদের খোঁজ খবর নিলেন। তারপর প্রায় দেড় ঘন্টা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেখভালের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা কর্মীদের কী কাজ হওয়া উচিত সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখলেন।

কলকাতায় বা জেলার বাইরে কাজের সূত্রে তিনি প্রায় থাকতেন। কিন্তু বাড়ির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। কমল গায়েন ও তাঁর স্ত্রী কাকলি গায়েনকে পরিবারের একজন হিসাবে রেখে দিয়েছিলেন। কমলদা শহিদ হবার পরও কাকলিদি ওদের কাছেই থাকতেন পরিবারের একজন হয়ে। একমাত্র মেয়ে তোতার (অন্বেষা ব্যানার্জী) মৃত্যু অশোকদাকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। তোতার স্মৃতিতে বার্ষিক অনুষ্ঠান হতো। আমাকেও আমন্ত্রণ করতেন। যেতাম। ওদিন অশোকদা অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। আবার সামলে নিতেন। আসলে ওনার একটি দরদি মন ছিল। লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্রীধরপুরে তাপসরা একটা জনসভা ডাকল। আমি বক্তা। অশোকদাও সাথী হলেন। ওখানেই তো বাড়ি। গাড়িতে নানান বিষয়ে বললেন। কীভাবে কাজ করতে হবে, জনসংযোগ বাড়াতে হবে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। শহিদ শিবশংকর চৌধুরীর কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বাড়ি বিক্রির টাকা হতে বেশ কিছু টাকা সেবাসদনে দান করে গেলেন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য।

২০১১-এর পরিবর্তনের জামানার পর বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন। বেশ কয়েকবার অসুস্থও হয়েছেন। দেখতে গেছি। দেখেছি মনোবলে এতটুকু চিড় ধরেনি। সাম্প্রতিক সময়ে সাংগঠনিক কাজের ধারার পরিবর্তন, নেতৃত্বেরও নিজেদেরকে সেই মতো পরিবর্তন করার বিষয়ে কিছু কিছু মতামত দিতেন। তখন এগুলিকে হয়তো অর্থোডক্স বা পিউরিট্যান মনে হতো। কিন্তু পরে বুঝেছি গভীর উপলব্ধি হতে ও অতীতের বাস্তব শিক্ষা হতে এগুলি বলতেন। অশোকদা এখন আর নেই। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে, আমাদের কাজের ধারায়, আমাদের ভাবনায়, চিন্তায়। কমিউনিস্ট আদর্শবোধে লালিত তাঁর সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' ভবিষ্যত প্রজন্মের সমবায় আন্দোলনকারীদের কাছে, গবেষকদের কাছে একটি দলিল হয়ে থাকবে। কমরেড অশোক ব্যানার্জী অমর রহে।

লেখক : *শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন সাংসদ ও সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য।*

স্মৃতিতে অশোকদা

অনিল মাইতি

জন্মসূত্রে অশোকদা ও আমি একই গ্রামের (শ্রীধরপুর, মেমারি) বাসিন্দা। বয়সে তিনি আমার চেয়ে ৭/৮ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর বিশাল কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। সে চেষ্টাও আমি করবো না। তবে কিছুটা কাছ থেকে যা দেখেছি, যা বুঝেছি তারই স্মৃতিচারণা করবো মাত্র।

যতটা জেনেছি তাঁর বাবা (কালিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্মসূত্রে কালনায় থাকতেন। অশোকদা ও তাঁর ভাই (সনৎ) দু'জনেরই জন্ম হয় সেখানেই। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীধরপুরে আসেন এবং শ্রীধরপুর হাইস্কুল থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে চলে যান মামার বাড়ি ভাতাড় থানার কুবাজপুর গ্রামে। ওখানেই ভাতাড় মাধব পাবলিক হাইস্কুলে বাকি পড়াশুনা শেষ করে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন। পরে প্রাইভেটে বি.এ।

বাইরে পড়াশুনার জন্য আমার ছোটবেলায় তাঁকে গ্রামে খুব একটা দেখতাম না। তবে স্কুল কলেজের ছুটির সময় তিনি গ্রামে আসতেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। সংস্কৃতিমনস্কতা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। তাই তিনি যখন বর্ধমানে থাকতেন তখনও প্রতিবছর গ্রামে এসে অ্যামেচার যাত্রায় অংশ নিতেন। ভালো অভিনয়ও করতেন। তাঁর সাথে যাত্রায় অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর প্রথম চাকরি কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরিতে, পরে মেমারি বিডিও অফিসে (তখন ব্লক ভাগ হয়নি) ট্রান্সফার হয়ে আসেন। সেখানেও তিনি কর্মচারীদের সংগঠিত করে মঞ্চস্থ করেন 'বঙ্গের বর্গী' নাটক। আমাদের ক'জনের সেই নাটক দেখার সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

বিডিও অফিসের চাকরি ছেড়ে চলে যান দুর্গাপুরে। কয়েক বছর পর সে চাকরিও ছেড়ে দেন। বেছে নেন শিক্ষকতার চাকরি রায়ান হাইস্কুলে। তখন ওই হাইস্কুলে যিনি

প্রধান শিক্ষক ছিলেন (শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি চক্রবর্তী)। তাঁর শিক্ষক জীবনের শুরু হয়েছিল শ্রীধরপুর হাইস্কুলে। পরে তিনি চলে যান রায়ানে। আমরা অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলাম। রায়ানের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন অশোকদা। এখানেই তিনি চাকরি জীবন শেষ করেন।

তাঁর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সম্পর্ক ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। ওই সময় মেমারি বিধানসভায় বাম প্রার্থী শ্রদ্ধেয় বিনয় কোঙার আর বর্ধমান লোকসভার প্রার্থী ছিলেন বাম-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শ্রদ্ধেয় এন সি চ্যাটার্জী (সোমনাথ চ্যাটার্জীর বাবা)। বিনয়দার সাথে অশোকদার সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। তাই নির্বাচনে তিনি যাতে কিছু সময় গ্রামে এসে দিতে পারেন, এই মর্মে একটি চিঠি লিখে বিনয়দা আমায় পাঠান। আমি বর্ধমান গিয়ে তাঁর হাতে চিঠিটা দিই। খুবই আগ্রহ সহকারে তিনি চিঠিটা পড়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'বেশ আমি যাব'। তারপর তিনি বেশ কয়েকবার গ্রামে এসে ২/৩ দিন করে থেকে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন।

ওই বছর মেমারি বিধানসভায় বামপ্রার্থী হেরে যান, তবে লোকসভায় জয়লাভ করেন। ওই বছরই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গণআন্দোলনের জোয়ার আসে। বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়, নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থাও গড়ে ওঠে। বর্ধমান শহরের বুকে আত্মপ্রকাশ করে 'অন্বেষা' সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংস্থা প্রযোজনা করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' নাটক (নাট্যরূপ দেন সম্ভবত শিশির সেন)। বিভিন্ন জায়গায় এই নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। ওই নাটকে অশোকদা ও বৌদি (গৌরী ব্যানার্জী) মূল দুটি চরিত্রে অভিনয় করতেন। শুনেছি, ওই 'অন্বেষা' নাম থেকেই তাঁর একমাত্র কন্যা তোতার ভালো নাম ছিল অন্বেষা। আমি ওই নাটক দেখে অভিভূত হয়ে যাই।

১৯৬৫ সালে শ্রীধরপুরে গড়ে ওঠে 'প্রগতি সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন (যা পরবর্তীতে 'কৃষ্টিচক্র')। এই সংস্থা ওই বছরই প্রযোজনা করে উৎপল দত্তর 'রাতের অতিথি' নাটক। ওই নাটক অশোকদা দেখে খুবই প্রশংসা করেন। যাইহোক আমরাও ঠিক করি 'হারানের নাতজামাই' প্রযোজনা করবো। আমাদের মহড়ার সময় যাতে তিনি একবার আসতে পারেন সেই মতো খবর দিই। তিনি আসেন। মহড়ার সময় তিনি বলেন, 'আমি কিছু বলবো না, শুধু দেখবো। তোরা যেমন ভেবেছিস তেমনই করবি, কাউকে নকল করবি না।' সত্যিই তিনি কিছু বললেন না, শুধু বললেন, 'তোদের প্রথম মঞ্চস্থের আগে আমায় খবর দিবি আমি এসে দেখে যাব।' প্রথম অভিনয়ের দিন উনি এসেছিলেন এবং সামনে বসে দেখেছিলেন। অভিনয়শেষে উঠে হাততালি দিয়ে বলেছিলেন 'সাবাস'। কিন্তু আমি তো বুঝলাম 'অন্বেষা'র ধারেকাছে আমরা ঘেঁষতে পারিনি। ওই নাটকের শেষে আমরা একটি গান যোগ করেছিলাম (যা অন্বেষার প্রযোজনায়

ছিল না)। অশোকদা বললেন, 'ওই গানটাই তোদের নাটকের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।'

১৯৬৯ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর সারা ভারত কৃষকসভার সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় বড়শুলে। সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বের প্রথম থেকেই অশোকদা ওখানে পড়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। ওই প্রস্তুতিপর্বের কাজে তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমিও প্রায় ১৫/২০ দিন পড়ে থাকি বড়শুলে। পেইন্টার্স ফ্রন্টের গোপালদার (গোপাল দাস, দুর্গাপুর) সহকারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। অসাধারণ শিল্পী ছিলেন গোপালদা। এত বড় শিল্পীর বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে লেখা সবই তিনি করতেন হাসি মুখে। কোনো ক্লান্তি ও বিরক্তি ছিল না তাঁর। আমি লেখার কাজে সাহায্য করতাম মাত্র। সম্মেলন হলের পশ্চাৎপটটি তিনিই আঁকেন। বিভিন্ন কাজের মাঝে অশোকদা আমাদের কাছে এসে বসতেন, খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর নিতেন। যেদিন রাতে বাড়ি (বর্ধমানে) ফিরতেন না, সেদিন আমাদের মধ্যেই থাকতেন। সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক ছিলেন তিনি।

অশোকদার বড় অবদান সমবায় আন্দোলন। যার শুরু শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে। ১৯১৮ সালে হংসেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (বার অ্যাট ল)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'। শুনেছি, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের প্রথম সভাপতি তিনি, প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন মনোমোহন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নেতৃত্বে আসেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় কালিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোকদার বাবা) প্রমুখ। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ অগ্রসর হতে থাকে। বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাননবাবুদের সঙ্গে পরিচালন কমিটিতে আসেন। ষাটের দশকের শেষে পরিচালন কমিটিতে আসেন অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও অশোকদা। সত্তর দশকের প্রথম থেকেই ওঁদের সঙ্গে আসেন বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি পর্যায়ক্রমে ২৯ বছর সম্পাদক ছিলেন।

সকলকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার অদ্ভুত মানসিকতা ছিল তাঁর। যেমন, অনাদিবাবু ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী। বামুন ছাড়া কারো হাতে জল পর্যন্ত খেতেন না। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুরে চাকরি করতেন। ছিলেন আই.এন.টি.ইউ.সি-র নেতা। একমাত্র বুদ্ধদেব ছিল (আমার সহপাঠী) সমমতাবলম্বী। সমবায়ের উন্নয়নে সকলকে নিয়ে কাজ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি কোনোদিন। সকলের মতামতকে তিনি যোগ্য মর্যাদা দিতেন (সে রাজনীতি থেকে সমবায়)। নিজের মতকে তিনি কোনদিন চাপিয়ে দিতেন না। কোনো কোনো সময় তিনি শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের কোনো পদে না থাকলেও তিনি ছিলেন অপরিহার্য। তাঁকে বাদ

দিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভাবাই যেত না। যতটুকু জানি, অশোকদার সাথে আলোচনা না করে কোনো কাজে হাত দিত না বুদ্ধদেব।

সত্তর দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় তাঁকে একটি মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। ওই সময় তিনি একদিন গ্রামে আসেন। সেইসময় গজিয়ে ওঠা জনৈক কংগ্রেস নেতা (মেমারিতে থাকতো) রাতের অন্ধকারে পুলিশ নিয়ে গ্রামে তাঁর বাড়িতে আসে। সেদিনই অশোকদা সকালেই গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে অন্য জায়গা থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বলি অন্যান্যদের মতো আমাকেও হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হয় রানিগঞ্জ, আসানসোল ও বার্ণপুর এলাকায়। তাঁরা জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে আমি তাঁর কেশবগঞ্জ চটির বাসায় প্রায়ই আসতাম। ওখানে তখন কমলদা (গায়েন) থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি বারে বারে। বৌদির কাছ থেকে পেয়েছি বড় দিদির স্নেহ, ভালোবাসা।

রানিগঞ্জ থানার যে গ্রামে আমি থাকতাম সেখানে ১৯৭৬ সালে এক গণ্ডগোল হয়। সেই গণ্ডগোলে আমাকে জড়িয়ে দেয়। ফলে ওই আস্তানাও আমায় ছাড়তে হয়। রামনারায়ণদা আমায় নিয়ে আসেন তাঁর বানপোতার বাসায়। পরে তিনি আমায় পৌঁছে দেন রায়না থানার কুকুরা গ্রামে আর এক সমবায়ী রবি নন্দীর বাড়ি। ওখানে থাকার সময় অমল হালদার ও উদয় সরকার প্রায়ই যেতেন। আমার খোঁজখবর যেমন নিতেন, তেমনি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দিয়ে আসতেন। ওখানে বসেই আমি '৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিই।

সাতাত্তরে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে পালাবদলের পর রবিদার পরামর্শমতো আমি আসি বর্ধমান পার্টি অফিসে (পার্কাস রোডে)। সেখানে তখন রামনারায়ণদা ও অশোকদাও ছিলেন। রামনারায়ণদার কথামতো দুদিন পর আমি অশোকদার কেশবগঞ্জ চটির বাসায়। পরদিন সকালেই তিনি আমায় মেমারিতে বিনয়দার বাড়িতে পৌঁছে দেন। সেদিন ছিল মেমারিতে বিজয় মিছিল।

পরদিন গ্রামের মানুষের উষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে গ্রামে আসি। আমার বাড়ি তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গ্রামের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় ঘর তৈরির পরিকল্পনা করি। অশোকদা বর্ধমানে বসে থাকেন না। তিনি গ্রামে আসেন এবং আমার ঘর তৈরির প্রয়োজনীয় কিছু খড় ও বাঁশ যোগাড় করে দেন। বর্ধমান ফিরে যাবার সময় আমার ঘর তৈরির জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যও করে যান।

'৭৭ সালে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিমঘর তৈরি হয় শংকরপুরে। তদারকির দায়িত্ব পড়ে অশোকদার উপর। হিমঘর তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তদারকি করে হিমঘর তৈরি করেন।

সমবায় আন্দোলনে বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় যেমন তাঁর সঙ্গে ছিল, তেমনি ছিলেন তাঁর ভাই সনৎ ব্যানার্জী, চন্দ্রশেখর মুখার্জী ও বিশ্বনাথ রায়। এঁদের সকলের ঐকান্তিক

চেষ্টায় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক উচ্চমার্গে পৌঁছায়। এঁদের সময়ই সাউথ-ইস্ট এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমবায়ের সম্মানে সম্মানিত হয় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

মাটির টানে, শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের দুর্নিবার আকর্ষণে, অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসায় শত কাজের মাঝেও তিনি বারে বারে ছুটে এসেছেন গ্রামে। বসে থাকতেন না গ্রামে এসে। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সমবায়ের কাজে ব্যয় করে গেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি সমবায় ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এলাকার অন্যান্য সমবায়গুলিকেও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। হন 'নাবার্ড'-এর ডিরেক্টর। সারা দেশে সমবায় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর লেখা 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' গ্রন্থটি সমবায় আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার বলে আমার বিশ্বাস।

২০১১। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এক সাধারণ সভায় তিনি আসেন। বক্তব্য রাখার সময় শাসক দলের স্বঘোষিত এক নেতা তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে। তিনি তাতে মানসিকভাবে দারুণ আহত হন, আহত হন শারীরিকভাবেও। তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করতে হয়।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়। একমাত্র কন্যা তোতার অকাল প্রয়াণ, ভাইয়ের মতো কমলদার নৃশংস খুন চোখের সামনে দেখেছেন। ভাই এবং ভাইপোর অকাল মৃত্যুতে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। তাতেও তিনি ভেঙে পড়েননি। বাইরে থেকে বোঝাই যেত না তিনি কতটা আহত। তিনি শেষবার গ্রামে আসেন ২০ এপ্রিল ২০১৮। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে। তারপর আর গ্রামে আসেননি। 'নতুন চিঠি'-তে একটু আধটু লেখালেখির সুবাদে আমার সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হতো মাঝেমধ্যে। যতটুকু জানি বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত কথা হতো, তা সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে।

নির্মম সত্যটা জানালো বুদ্ধদেব। মোবাইলে সে জানালো অশোকদা আর নেই। কথাটা শোনার পর নির্বাক হয়ে গেলাম। দীর্ঘ এক সংগ্রামী জীবন থেমে গেল ৮৩ বছর বয়সে। যে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ছিল তাঁর গর্ব, অহংকার, যাকে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, সেই কো-অপারেটিভের কাছেই তিনি অপমানিত হয়েছিলেন। তাই বোধহয় এক বুক অভিমান নিয়েই তিনি চলে গেলেন। অপূরণীয় ক্ষতি হলো সমবায় আন্দোলনের।

অশোকদা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে। তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি অমর। তাঁর কাছে আমি বহুভাবে ঋণী। অবনত মস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি—অশোকদা অমর রহে....।

লেখক : *সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর সহযোদ্ধা।*

অশোকদাকে মনে রেখে

জহর মুখোপাধ্যায়

অশোকদা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ঠিক কীভাবে শুরু করা যায়? প্রায় চারদশক ধরে অশোক বন্দ্যোপাধায়ের সান্নিধ্য পেয়েছি, তবু শ্রদ্ধামিশ্রিত দূরত্ব একটা থাকতই। তিনি ছিলেন যে কথা, ঠিক তখনই সেই কাজের মানুষ। তাই অবাক হয়ে দেখলাম, কাজটি তিনি করেই ছাড়লেন। যদিও এবার কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না। লক্-ডাউনের মধ্যেই কোনও নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে চলে গেলেন ২৯ মার্চ সকালের শেষ বেলায়। শেষ সময়ে তাঁকে দেখতে না পারার আফশোস নিয়ে ভেবেছি, কিছুদিন আগেই তো তিনি ডিপ্লোম্যাট নার্সিংহোমে অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন। দেখতে গেছি, তখনও তাঁর মস্তিস্ক প্রখর। আমায় দেখে বললেন কেন আমি খোঁড়া পায়ে উপরে উঠে দেখতে গেছি। তারপর বাড়ি ফিরলেন। এবার ভর্তি হবার পরও তিনি ফিরেই আসবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু এবার অন্যথা হল। নিবেদিতপ্রাণ এক সংগ্রামী জীবন শেষ হল। জেলার সমবায় আন্দোলনে আমরা অভিভাবকহীন হলাম। কিছুদিন আগেই তাঁর উত্তরসূরী বিশিষ্ট সমবায়ী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি। এ শূন্যতা আমাদেরই পূরণ করতে হবে।

অশোকদার সরল সাদামাটা জীবনযাপন, নিরলস কর্মোদ্যোগ ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা সম্পর্কে আমরা বর্ধমানবাসীরা সবাই জানি। এও জানি নানা অসুস্থতার মধ্যে নিজেকে কীভাবে সচল-স্বাভাবিক রাখতে পারতেন। সুশৃঙ্খলভাবে চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা ও পরামর্শ মেনে চলতেন। জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কৃষক আন্দোলন, শিক্ষকতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলন থেকে শেষে সমর্পিতপ্রাণ সমবায়ী এবং মানুষকে সাথে নিয়ে প্রকৃত সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য ও দেশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। নির্যাতন ও কারাবরণ সহ্য করেও একই সাথে ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। আবার আটপৌরে পাজামা-পাঞ্জাবিতে ও সাধারণ জীবনাচরণে সমাজের উপরতলার মানুষদের মধ্যেও প্রয়োজনে তাঁর প্রত্যয় ঘোষণা করে গেছেন। সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, নাবার্ড কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রথী-মহারথীদের দেখেছি তাঁর সাথে শ্রদ্ধাশীল আলাপচারিতায়। অশোকদা তাঁদের কাছে নিজস্ব মতামত দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপনার্থে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুরির সম্মেলনে উপস্থিত

আমলারাও লক্ষ্য করতেন কীভাবে সভাপতি হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচ্যসূচির সবকটি বিষয়ের উপর আলোচনা আহ্বান করতেন এবং যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতেন। শুধু তাই নয়, একবার পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত সভায় একজন পদাধিকারী একটি বিষয়ে আপত্তি জানান—অশোকদা তৎক্ষণাৎ তাঁকে একটি দিন স্থির করে জানাতে বলেন—এবং নিজে পুরুলিয়ায় সেই গণ্ডগ্রামে উপস্থিত থাকবেন ও সবটা দেখবেন আশ্বাস দেন। একেবারে নীচে নেমে কাজ করার এরকম অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন। আউশগ্রামের জঙ্গলমহল এলাকায় প্রাথমিক কৃষি সমবায়ে তাঁর সাথে একটি সভায় গিয়ে দেখেছি, সেখানকার আদিবাসী মানুষগুলির সাথে মহিলারাও সভা শুরুর আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘিরে ধরেছেন। প্রকৃত সমবায় যাঁদের জন্য সেই গ্রামের সাধারণ মানুষদের সাথে অশোকদার আত্মীয়তা, বহুদিনের অক্লান্ত অবদানের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছিল।

তিনি ১৯৮৫ সালে বর্ধমান জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি ছাড়াও সমবায় সংগঠনের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে নানা পদে দায়িত্ব সামলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি মঞ্চ থেকে 'সমবায়রত্ন' খেতাব অর্জন করেন ও সেই সাথে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পান। ওই সভামঞ্চেই তিনি ওই টাকা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে দান করার কথা ঘোষণা করেন। অশোকদার কাছ থেকেই শোনা, তাঁর এই ঘোষণা শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। এর আগে কেউ এমনটা করেননি। এও এক অনন্য নজির তিনি রেখে গেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ওয়েস্টবেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ও ওয়েস্টবেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যখন আর্থিক সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে 'বৈদ্যনাথন কমিশন' গঠন করে, তৎকালীন নাবার্ড-কর্তা ডাঃ ওয়াই.এস.পি থোরাট অশোকদাকে এই কমিশনে যুক্ত হতে বলেন। প্রথমে রাজি না হলেও অনেকের অনুরোধ- উপরোধে তিনি যুক্ত হন ও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সমবায় সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন থেকেও একেবারে মাটির থেকে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পাশাপাশি লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি লিখতে পেরেছেন সমবায় বিষয়ে কোষ-গ্রন্থটি—'সমবায় ও মানবসভ্যতা'।

এ রাজ্যে ২০১১ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অশোকদাকে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। বিভিন্ন স্তরে তাঁকে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এবং নানাভাবে কুৎসা ও অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। আমরা কষ্ট পেয়েছি ও প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তিনি অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন অবিরাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ কর্মসূচি রাজ্য সমবায় বাঁচাও মঞ্চের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বর্ধমানে 'জাগরী'-তে। শরীর বাদ না সাধলে তিনি প্রায় সব কর্মসূচিতেই হাজির থাকতেন। অত্যন্ত কষ্ট করে, পার্কাস রোডে প্রভাত কুণ্ডু ভবনে চারতলায় উঠেও

সভায় উপস্থিত থেকে সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো কর্মসূচি না থাকলে 'নতুন চিঠি' অফিসে নিয়মিত যেতেন।

অশোকদার সঙ্গে কতবার মতান্তর হয়েছে, আবার তিনিই কাছে টেনে নিয়েছেন। কখনো কিছু মনে রাখেননি। এইরকম এক সংগ্রামীর জীবনাবসানে অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে। তাঁর সকল অবদান স্মরণ করে, চলমান জীবন-প্রবাহে আমাদের 'তরণী বাওয়া'-কে তাঁর শরণ নিতেই হবে। সমবায়ের সাতরঙা পতাকার প্রকৃত প্রাণময়-স্বপ্নময় প্রতিনিধি অশোকদাকে জানাই লাল সেলাম।

পুনশ্চ : তাঁর জীবনসঙ্গিনী গৌরীদির কথা বাদ দিই কেমন করে! সারা জীবন পাশে থেকেছেন। তারপর এই লকডাউনের মাঝে এই বয়সেও প্রায় সব কর্মসূচিতে হাজির গৌরীদি। তাঁর এই 'অ-শোক যাপন'-এ আমার ঈর্ষা হয়।

লেখক : *সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা।*

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়—একান্ত ব্যক্তিগত

জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী

১৯৮৮ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টের রিজার্ভ ব্যাংকের তিনজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তাঁদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের 'রজনীগন্ধা' হলে একটি সভার আয়োজন হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাংকের তরফে উপস্থিত আধিকারিকদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

সভা চলাকালীন দেখছি এক সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা প্রৌঢ় রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করছেন। মনে মনে বিরক্ত যে হইনি তা নয়। কিন্তু দেখলাম যে উনি মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলের PACSO সম্পর্কে একটি মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের পদক্ষেপ ঠিক নয় বলে জানাতেও দ্বিধা-বোধ করেননি। এরপর আমার ওনার প্রতি শ্রদ্ধাটা বেড়ে গেল।

পরদিন অফিসে এসে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এ.সি. তপাদারকে ওনার সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, ওনাকে চেনেন না? উনি বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আপনাদের ব্যাংকের আগামী দিনের চেয়ারম্যান।

১৯৮৯ সালের ২৭ জুন মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রিজার্ভ ব্যাংকের আধিকারিকদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চেয়ারম্যান হয়ে আসেন। সেদিন কর্মচারীদের মধ্যে সাজ-সাজ রব। কেউ আনন্দে আবার কেউ ভয়ে। মালা নিয়ে সব সংগঠনের নেতারা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করেন। অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হতে আমি স্যারের সাথে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে বোর্ড-রুমের তিনটে আলমারির চাবি ওনার হাতে তুলে দিয়ে চলে আসি।

দুদিন পর ব্যাংকে এসে আমায় ডেকে পাঠান। বোর্ডরুমে স্যার একাই ছিলেন। যেতেই আলমারির চাবিগুলো আমায় ফেরত দিয়ে বললেন—এগুলো তোমার কাছেই রাখবে জ্যোতি। সেই থেকেই আমি স্যারের কাছে 'জ্যোতি' হয়ে গেলাম। তিনতলা থেকে আমার বসার জায়গা দোতলায় করে দিয়েছিলেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বিশেষ আদেশে তিনি কর্মচারীদের কোনো ধরনের বদলি বন্ধ করে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দূরদর্শিতা। মাস ছয়েক পর ট্রান্সফারের

খসড়া আমায় দিয়ে বললেন—এটা কনফিডানসিয়াল, কেউ যেন জানতে না পারে।

এই ট্রান্সফারের খবরটা আমার সংগঠনের নেতারা পেয়ে আমায় চাপ দিতে শুরু করেন এবং এই বলে ভয় দেখান যে "আমাদের সাথে অশোকদার(?) সম্পর্ক তো জান। উনি কিছু বলবেন না। 'আমি কপি না দেওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ওনারা চলে যান। স্যার আসতেই ঘটনাটা বলায় আমায় একটা কথাই বলেছিলেন—"তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

এরকম অনেকবার আমার বিরুদ্ধে গোপনীয়তা ফাঁসের মিথ্যে অভিযোগ জানানো হলেও তিনি কোনদিন তা বিশ্বাস করেননি—ফলে ব্যাংকের উপর আপনা হতেই দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়।

ব্যাংকের এ্যাসেট বাড়ানো তাঁর মজ্জায় ছিল। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরির সময় রাত ১২টা-১টা অবধি কাজের তদারকি করেছেন। এসব দেখে নিজেরাও উৎসাহিত হয়েছি।

জ্যোতি বসু নতুন বাড়ি উদ্বোধন করেছিলেন। উপস্থিত মন্ত্রীদের মধ্যে বিনয় চৌধুরী, অসীম দাশগুপ্ত, ছায়া ঘোষ ইত্যাদিরা ছিলেন। ওনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমি কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দিলে সেটা মন দিয়ে শুনতেন। কোন কোন সময় সেটা গ্রহণ করেছেন।

তখন স্যার ডব্লু.বি.এফ.সি-র চেয়ারম্যান। একদিন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর একটা চিঠি স্যারের অনুমতি নিয়ে আমায় ইস্যু করতে বলেন। চিঠিটা পড়ে আমার খটকা লাগে। স্যার তখন ডব্লু.বি.এফ.সি যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমায় চিঠিটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু জানতে চাওয়ায় বললাম 'না'। কেন? আপনি ঘুরে আসুন তখন বলব। 'ঠিক আছে' বলে উনি চলে গেলেন। ওই অফিস থেকে এসেই আমায় ডেকে

পাঠিয়ে চিঠিটা না দেওয়ার কারণ জানতে চাওয়ায় বললাম—যদি এই চিঠি সেই কর্মচারীকে দেওয়া হয় এবং যে কারণের কথা বলা হয়েছে সেই কারণ দেখিয়ে অন্য এক কর্মচারীকে দিতে হবে। ব্যাপারটা বুঝে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে ডেকে ওই চিঠি ইস্যু না করার কথা বলেন। আসলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইউনিয়নের টানে ওই চিঠি তৈরি করেছিলেন।

ব্যাংকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন অদ্ভুত দক্ষতায়। কোনো চাপের কাছে মাথা নত করতে দেখিনি—এমনকি রাজনৈতিক চাপের কাছেও।

বিভিন্ন আধিরকারিক সংগঠনের চাপে ভুল নোট পেশ করতেন। যেহেতু আমার মাধ্যমে তা যেত ফলে কোনো গণ্ডগোল দেখলেই স্যারকে জানিয়ে দিতাম। এরকম একটা ভুল এ্যাজেন্ডা বোর্ড-এ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার কাছে আসে। স্যারকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতেই অফিসারদের ডেকে ধমকে বললেন—"আমি সত্যিই একজন ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি পেয়েছি—যে আজ একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দিয়েছে।"

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করা ও সদস্যাদের উৎসাহিত করতে তিনি ওই গোষ্ঠীর সাথে সভা করতে যেতেন—সঙ্গী হতাম আমি।

সেবার বালুরঘাটে এক সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে গিয়েছি। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলমান একসাথেই থাকে ও বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলেই গ্রুপ। প্রায় দেড়শোজন মহিলা সদস্যা উপস্থিত। হঠাৎ স্যার একটি প্রশ্ন করলেন—"দেখছি গ্রুপের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ আছেন। যদি এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় আপনারা কী করবেন?" প্রশ্নটা এখানকার সময়ে কেউ করতে পারবে কিনা জানি না। উত্তর শুনে অবাক না হয়ে থাকতে পারিনি। —"আমাদের রক্ত লাল—ওই দাঙ্গা এখানে হতে দেব না।" গ্রামটার নাম মনে নেই। চাইব যেন সেই মানসিকতাই এখনো বজায় থাকে।

আরও একবার সুন্দরবনে গেছি। ওখানে গেলে রাঙাবেলিয়ার তুষারদার কাছে যেতেন। তুষার কাঞ্জিলাল। গ্রামে মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। একরাত থেকে পরদিন যাব ঝড়খালি। ওখানে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর সাথে সভা আছে। দীর্ঘ পথ। শেষ অব্দি যখন ওখানে পৌঁছলাম তখন ভাটার টানে লঞ্চ এগুতে পারেনি। পাড়ে দেখছি তখনও মহিলারা অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ দেখি স্যার গামছা পরে প্রস্তুত। হেঁটে যাবেন। অনেক বুঝিয়ে ওনাকে ওভাবে যাওয়া থেকে বিরত করি। শেষ অব্দি নৌকো করে সদস্যারা এসে লঞ্চেই সভা করেছিলেন। সমবায়কে তিনি ভালোবাসতেন। দল-মতের কোনো পার্থক্য ছিল না।

NAFSCOB-এর সর্বভারতীয় সভাপতি হয়ে বিদেশ সফর শেষে উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দেওয়ায় ওই সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আমায় স্যারের সততা সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেটা এখানে প্রকাশ করা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে ঘুরে আসার পর যে হিসাব দাখিল করেছিলেন

সেটা দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। নদী পারাপারের নৌকো ভাড়া থেকে রিকশা ভাড়া কোনটাই বাদ যায়নি হিসাব থেকে। অফিসের বিরোধী কর্মচারী সংগঠনও কোনোদিন স্যারের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

সমবায়ের নিয়মানুযায়ী ১৬.৫.১৯৯৫-তে মইনুল হাসানকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে নিজে ডিরেক্টর হিসাবে থাকেন। কিন্তু এম.পি হওয়ার পর ২০.৮.৯৮-তে মইনুল হাসান পদ্যতাগ করায় স্যার আবার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬.১.২০০৫ অবধি ওই দায়িত্বে ছিলেন।

ওই সময়টা আমার সাথে সম্পর্কটা অনেকটা দাদা-ভাই-এর মতো। তবে কাজে গাফিলতি হলে একদম ছেড়ে কথা বলতেন না। ঠাট্টার ছলে বলতাম, স্যার আমি বেতনের ৭০ শতাংশ পাই আপনার বকা খাওয়ার জন্য, আর বাকি ৩০ শতাংশ কাজের জন্য। মুচকি হাসতেন স্যার।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সমবায় আন্দোলনকে ভারতে প্রথম সারিতে তুলে এনেছিলেন রাজ্যকে। প্রধান অফিস নির্মাণ ছাড়াও কুচবিহার, ডায়মণ্ডহারবারের অফিস নতুন ভাবে তৈরি করান। বনগা, বারাসত ছাড়াও শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চকে স্থানান্তরিত করে দিবা-রাত্রির ব্রাঞ্চ হিসাবে চালু করেন। ওই শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের ৭ দিন আগে আমায় আর স্পেশাল অফিসারকে পাঠিয়ে দেন নিমন্ত্রণপর্ব সারবার জন্য।

NAFSCOB-এর সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। মূল দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমায়।

আর.বি.আই, নাবার্ড-এর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিত স্যারকে। বিভিন্ন কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি।

এবার একটা বকা খাওয়া ও আমার তার প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। তখন তিন মাস অন্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের কনফারেন্স হতো। বিভিন্ন জেলায়। জেলায় হলে স্যার মন্ত্রী, সেক্রেটারি, আর.সি.এস ইত্যাদিকে D.O দিয়ে ওই সভায় যাওয়ার অনুরোধ করতেন। D.O টা আমিই তৈরি করে দিতাম। সেবার বিশেষ কারণে জরুরি সভা ডাকতে হয় ব্যাংকের প্রধান অফিসে। সবাইকে নোটিশ পাঠানো হলেও আগেকার প্রথানুযায়ী D.O দেওয়া হয়নি। মিটিং-এর দিন সকালে আর.সি.এস স্যারকে ফোন করে জানান যেহেতু D.O পাননি সেই হেতু তিনি আসতে পারছেন না। স্যারের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আসেননি। সঙ্গে সঙ্গে আমায় ডেকে D.O না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরটা শুনে উনি রেগে বললেন, এতটা স্বাধীনতা তোমায় দিইনি।

আমিও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দিন পনেরো পর আর.সি.এস ব্যাংকের বোর্ডরুমে মন্ত্রীকে নিয়ে একটা সভার ব্যবস্থা করলেও স্যারকে কোনো চিঠি দেননি। ওই সভায় স্যার যাবেন কিনা জানতে চাইলে সোজা বললাম—নেমন্তন্ন পাননি, কেন যাবেন? সভার দিন স্যার উসখুস করছেন। বললাম, কী হল স্যার? দেখ

মন্ত্রীমশাই ব্যাংকে এসেছেন। না যাওয়াটা খারাপ। বললাম, নেমন্তন্ন না পেয়ে, D.O না পেয়েও শুধু খবরটা শুনেই আপনি যাচ্ছেন সভায়। সেদিন আপনি বললেও আর.সি.এস কেন আসেননি? হেসে বললেন—ওই দিনের ব্যাপারটা তুমি ভোলনি—না? এরকম সম্পর্ক ছিল আমার সাথে।

১৯৮৯-২০০৫ ও পরবর্তীকালে ২০০৬-২০০৯ (WBIDFC)-তে স্যারের সম্পর্ক উন্নততর হয়েছে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কারের টাকা বিনা দ্বিধায় দিয়ে দিয়েছেন সমবায়ের স্বার্থে। অভাবী সংসার হওয়া সত্ত্বেও। ২০০৬-তে আমার চেন্নাইতে অপারেশনের দিন পৌঁছে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে। যাতে আমি আর্থিকভাবে কোনো অসুবিধায় না পড়ি। অপারেশনের পর জ্ঞান ফিরে প্রথম স্যারকেই দেখেছিলাম।

স্যার কোলকাতা ছাড়ার পর প্রতি রাত ৮টা থেকে ৮.৩০-টার মধ্যে স্যারকে ফোন করে শরীরের খোঁজ খবর নিতাম। ফোন ধরেই বলতেন, 'হ্যাঁ জোতি বল'। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। পরের দিকে একটু শোনার সমস্যাও হচ্ছিল। ফোনে না পেলে বৌদির সাথে কথা বলে শান্তি পেতাম। আজ আর সেই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে না, আর শুনতে পাব না 'হ্যাঁ জোতি বল'— কথাটা। এ দুঃখ, বেদনা কাকে জানাব। স্যার আছেন, থাকবেন প্রতিটি কাজের সাথে।

—লেখক দীর্ঘদিন প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থ নিগমে।

প্রশাসক ও ব্যাঙ্কার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় : এক আলোকবর্তিকা

বিশ্বজিৎ মাইতি

শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার কখনো কমরেড বলা হয়ে ওঠেনি। অফিসে যতদিন সহকর্মী ছিলাম উনি ছিলেন 'স্যার'। অফিস ছেড়ে দেবার পর হলেন 'কাকু'। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মেলামেশায় ব্যক্তি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি দেখেছি, তবুও প্রশাসক হিসাবে তাঁর ভূমিকা আমার কাছে কেমন ছিল—তা এই অল্প পরিসরে কোনোভাবেই লেখা সম্ভব নয়।

আমি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী একপেশাদার ব্যক্তি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল আমার প্রাথমিক ছাত্র রাজনীতি। তখনও পেশায় আসিনি অর্থাৎ চাটার্ড একাউনট্যান্ট হইনি।

অনেক টানাপোড়েনের পর একদা অডিট ফার্ম খুলেছিলাম। একা করলে সময়ের অভাব হবে। তাই দীর্ঘদিনের বন্ধু সি.এ. কে সাথে নিয়ে ফার্ম চালু হলো। পুঁজি নেই, অফিস নেই, কোনো ক্লায়েন্ট নেই। চরম অসহায় অবস্থা। বন্ধু বললো সি.এ. হয়ে এত লড়াই সম্ভব নয়। আসলে কারোর সাহায্য না নেওয়ার জিদ ছিল। বন্ধু আমাকে না জানিয়ে আমার দাদাকে কষ্টের কথা বললো। দাদা (প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) সব শুনে ওকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললো ওনার সাথে দেখা করতে। উনি বলে রাখবেন। বন্ধু কার্ডটা আমাকে দেয়। একটু বিরক্ত হয়ে কার্ডের নামটা দেখি। উনি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব একটা চিনতে পারলাম না। প্রথমে গেলামও না। দাদা ডেকে পাঠালেন। তখন আমি আলাদাভাবে এক মেসে থাকি। দাদা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, কি পার্টি করিস? ওনাকে চিনিস না। আমার পেশেন্ট। জ্যোতিবাবুও (বসু) ওঁকে বেশ শ্রদ্ধা করেন। ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে জিজ্ঞাসা ও করেছেন। 'আমি ইতস্তত

করে বন্ধুকে সাথে নিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রীটের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হেড অফিসের প্রায় জরাজীর্ণ বাড়িতে চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে গেলাম। কি অনাড়ম্বর অথচ মন ছুঁয়ে যাওয়া আপ্যায়ন! নিজের থেকেই বললেন,' ''তোমাদের ফার্ম তো পুরানো নয়, অভিজ্ঞতাও কম। তবে নতুনদের তো আমাদের দেখা উচিত। যোগ্যতা তো একই থাকে। আমি বিত্তনিগমে (পশ্চিমবঙ বিত্তনিগম) বলে রেখেছি, একবার যাও। আমার সাথে মাঝে-মধ্যে দেখা করবে। কোন সংকোচ নয়, পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাবে। এটা ভিক্ষা নয়। সামান্য আশ্বাস, কিন্তু এক দুর্নিবার মোহগ্রস্ততায় জড়িয়ে দিলেন।

অশোকবাবুর সুপারিশে বিত্তনিগমের পরিচালন অধিকর্তা একটা ছোট অথচ দুরূহ কাজ দিলেন উত্তরবঙ্গের একটি ঋণ আবেদন খতিয়ে দেখতে। শুনেছিলাম প্রায় সবাই ওই ঋণের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু আমাদের রিপোর্ট সম্ভবত পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিশেষ করে অশোকবাবুর বিশ্লেষণ। ওই উদ্যোগী দাঁড়িয়ে যায় পরে, দারুণভাবে, আর ওই ঋণগ্রহীতা অশোকবাবুর প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকেন, জেনেছি। পরে অশোকবাবু নিগমের আভ্যন্তরীণ অডিটর করার সুপারিশ করেন আমাদের ফার্মকে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেটা আর হয়নি। আমরাও ওনাকে আর এ বিষয়ে বিরক্ত করিনি। কিন্তু বিত্তনিগম নিয়ে একটা ছোট অথচ অশোকবাবুর দূরদর্শিতার কথা উল্লেখ করতে চাই। আমরা বিত্তনিগমে কাজ আর না পেলেও, ততদিনে আমার সাথে অশোকবাবুর ঘনিষ্টতার কথা অনেকেই ওখানে জেনে গিয়েছিল। আমাকে প্রায় উনি বিভিন্ন পরামর্শের জন্য মাঝে মধ্যে ডেকে পাঠাতেন। অন্যভাবে পরিচিত হলেও অচিরেই কথাবার্তায় উনি বুঝে গেছিলেন যে আমিও বামপন্থী মতাদর্শ ঘরানায় বেড়ে উঠেছি। পরে আমার যোগসূত্রও জানতে পারেন। তারই ফলে এই ঘনিষ্ঠতা প্রায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার দিকে মোড় নেয়। স্যার থেকে 'কাকু' হয়ে উঠলেন। ওনার স্ত্রী আমার অত্যন্ত প্রিয় কাকিমা গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রয়াত বোন তোতাও আমার প্রিয় হয়ে উঠলো।

বিত্তনিগমের কিছু অফিসার আমাকে মাঝে মধ্যে কিছু কঠিন কঠিন ঋণ (যেগুলো মঞ্জুর হওয়া একটু সমস্যার) প্রস্তাব পাঠাতেন। ওরা কেউ কেউ হয়তো ভাবতেন যে আমরা রিপোর্ট প্রস্তুত করলে বোর্ডে অশোকবাবু না করার আগে অনেক ভেবে দেখবেন। আমরা ঐ কারণে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু একটা কেসে আমি অনেকটা ভদ্রতার বশে বাধ্য হই।

শীত পড়ার মুখে অশোকবাবু প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সেবারে বেশি অসুস্থ হলেন। পিজি হাসপাতালে হৃদরোগ বিভাগে ভর্তি হলেন। তখন পিজি হাসপাতালে আমাকে প্রায় অনেক ডাক্তার, কর্মচারী বেশ ভালো জানতেন। যার ফলে কেবিনে অশোকবাবুর সাথে একটু বেশি সময় কাটালে কেউ কিছু বলতো না। পুত্রবৎ স্নেহের সুযোগে ওই ঋণের কথা হাসপাতালে আবার বললাম। উনি তখনও রাজি হলেন না। শুধু বললেন যে, ভদ্রলোক ভুল করেছেন বলে নয়, যাকে সহজে প্রতারণা করা যায়,

তাকে সাধারণ মানুষের টাকা দেওয়া সমীচীন হবেনা। আমি অনেক যুক্তি দেখিয়ে বললাম,জীবনে অনেকেই ভুল করে। তাকে সুযোগ দিয়ে দাঁড় করানোতো মহত্ব!' এইরকম কয়েক দিন আলোচনার পর উনি একটু নিমরাজি হয়ে বললেন,' ঠিক আছে, দেখবো। তবে আমার একটা শর্ত তোমার উপর থাকবে। ঋণ পেলে ঐ ভদ্রলোককে রিটেনার পরামর্শদাতা হিসাবে তোমার ফার্মকে রাখতে হবে, যাতে তোমরা নিয়মিত ওদের পরামর্শ দাও এবং ঐ পরামর্শমতই ওনাকে চলতে হবে। এই শর্তের কথা নিগমের অফিসারদের মাধ্যমে ভদ্রলোককে জানানো হলো। পরে যথারীতি ঋণ ও মঞ্জুর হয়ে গেল।

ভদ্রলোক ওনাদের লেটারহেডে আমাদের পরামর্শদাতা হিসাবে একটা ন্যূনতম পারিশ্রমিকের উল্লেখ করে চিঠিও দিলেন। কারখানায় উৎপাদন শুরু হলো। আমরাও কয়েকমাস ট্রেনে করে কলকাতা-কল্যাণী করতে লাগলাম। 'এরকম চার-পাঁচ মাস চলার পর লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক আমাদের এক-একটু করে এড়িয়ে যেতে শুরু করছেন। আমরা পৌঁছলেই উনি কারখানার প্রোডাকশনের জায়গায় চলে যেতেন। ডেকে পাঠালে আসছি বলে আসতেন না। পরে কাগজ-পত্র ও দেখানো বন্ধ করে দিলেন। আমরা হতোদ্যম হয়ে কল্যাণী যাওয়া বন্ধ করলাম এবং নিগমের অফিসারদের সব জানালাম। জানতে পারলাম বিত্তনিগমের টাকা-পয়সা দেওয়াও বন্ধ করে দিতে শুরু করেছিল। আমাদের পারিশ্রমিকও পাইনি। পরে খোঁজ নিয়ে আরো জানলাম যে বিখ্যাত এক কেবল তৈয়ারির প্রতিষ্ঠান ওই ভদ্রলোকের নামে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন তাদের কেবলের জাল প্রোডাক্ট বানানোর অভিযোগে। আমি বুঝে যাই অশোকবাবুর দূরদৃষ্টি কতটা সুদূর প্রসারিত ছিল। আমি কোনদিন অশোকবাবুর কাছে লজ্জায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারিনি। উনি নিশ্চয় অবহিত ছিলেন। উনিও কোনদিন আর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি।

১৯৯৬ সালের শেষের দিকে একদিন জরুরিভিত্তিতে আমাকে বিত্তনিগমের অফিসে ডেকে পাঠালেন। উনি তখন বিত্তনিগম এবং রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-দুটোরই চেয়ারম্যান। বললেন, রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। বেশ কিছু টাকা কো-অপারেটভ ব্যাঙ্ক যোগাড় করে দিতে পারে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধা। সরকারকে ধার দেওয়াতে ওদের ঘোরতর আপত্তি। আমি ভেবেছি একটা এনবিএফসি গড়বো, বাজার থেকে টাকা তুলে রাজ্যকে দেবো। পরে চেষ্টা করবো, এটিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রুপান্তরিত করতে। তুমি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনসহ যাবতীয় আইনি দিক দেখা ছাড়াও এই রকমের কোম্পানি গঠনের 'অবজেক্ট ক্লজ'গুলো দাও। আমি রাজ্যসরকারের সাথে কথা বলেছি। আমি ওনাকে সাধ্যমত সাহায্য করার পাশাপাশি এক নতুন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার যুদ্ধে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করতে নেমে পড়লাম। অশোকবাবুর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো এই রাজ্যের তো বটেই ভারতের অন্যতম এক গর্ব করার মতো একস্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান 'পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো

উন্নয়ন বিত্তনিগম' যা 'ওয়েস্টবেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স করপোরেশন' নামে আজ পরিচিত। কর্মী বলতে দুজন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ডেপুটেশনে নেওয়া বিত্তনিগমের একজন অফিসার ও একজন টাইপিস্ট। উনি জানতেন আমি চাকুরি করবো না, তাই অডিটার করে আমাকে বেঁধে রাখা। নামে অডিটর, আসলে অনেক কিছুই আমাকে দেখতে হতো, করতে হতো আবার কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসাবে ওনার বেশ কিছু কাজের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হতো। প্রথমে তো পারিশ্রমিকও ছিলনা। পরে ও যা দেওয়া হতো, তা যৎসামান্য। যত কম খরচে, যত কম পরিচালন খাতে খরচ করে কোম্পানিকে দাঁড় করানো যায় তারই চেষ্টা। দুটো অন্য সংস্থার কাজ, সমবায় আন্দোলনের কাজ (রাজ্য ও দেশজুড়ে), পার্টির কাজ করার পর যতটুকু হাতে সময় পেতেন এখানে এসে পড়ে থাকতেন। কলকাতায় থাকলে রাত্রি অনেকক্ষণ অবধি। আমাকেও থাকতো হতো। আমার ও ফার্মের বেশ কিছু কাজ বাড়ছিল, হোম এবং অন্যান্য সংগঠনের কাজে ঢিলে পড়ছিল। একদিকে অশোকবাবুর নিত্য নতুন চিন্তা-ভাবনার শরিক হওয়ার অমোঘ আকর্ষণ অপরদিকে ফার্মের অসুবিধা—এই দুই সমস্যা আমারও বাড়তে লাগলো। আমার সমস্যার কথা জেনেও বললেন, 'আমি যতদিন থাকবো, তোমাকেও থাকতে হবে'। আমার এবং আমার বন্ধুর প্রবল অনীহার বিরুদ্ধে আমাকে কোম্পানিতে পাকাপাকিভাবে যোগদান করতে বললেন। এদিকে আমার পারিবারিক এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই। তবুও ওনাকে না করা আমার পক্ষে আসাধ্যই ছিল। ফার্ম ছেড়ে আসতেই হলো, বন্ধুর বাধা উপেক্ষা করে, একটু ভালো উপার্জন ত্যাগ করেই। যেদিন আমরা অফিসে রাত্রি করে থাকতাম শুধু যে অফিসের কাজ নিয়ে মশগুল থাকতাম তা নয়, কাজের বাইরেও প্রচুর মতবিনিময় হতো বিভিন্ন বিষয়ে। যেমন দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার (এখানে ওনার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল যা সবার কাছেই দৃষ্টান্তমূলক), বাজার অর্থনীতি, উচাঙ্গসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে, আর যদি কোনদিন মন্টুদা (অরিন্দম কোঙার) কলকাতা থাকাকালীন চলে আসতেন তো কথাই নেই।

আমাদের করপোরেশন বা কোম্পানির কথায় আসি। আমাদের লক্ষ্য ছিলো দেশের বাজার থেকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা, যা তখনকার দিনে এই রাজ্যের পক্ষে ও তার কোন সংস্থার পক্ষে ভীষণ কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু আমাদের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় একাজে ধীরে ধীরে ভারতের বুকে অনন্য নজির গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কিছু ব্যাঙ্ক আর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের কাজকর্ম লক্ষ্য রেখে দারুণভাবে পাশে দাঁড়ায়। সেই টাকা আমরা রাজ্যকে ঋণ দিই রাজ্যের মধ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, বিভিন্ন ব্রিজ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গঠন, রাস্তা-ওভারব্রিজ তৈরি, সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, গণপরিবহণ ব্যবস্থা, গভীর নলকুপ বসানোর কাজ, বেসরকারি বিমাননগরী, পাচঁতারা হোটেল নির্মাণ,

বেসরকারি হাসপাতাল গড়া থেকে বিভিন্ন রকমের পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজে। পরপর দুবছর এই কোম্পানি সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে রাজ্যের পয়লা নাম্বার ইনকাম ট্যাক্স প্রদানকারী সংস্থার সম্মানও পায়, প্রখ্যাত সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পেছনে ফেলে। ওনার নেতৃত্বে কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হরেক রকমের কাজ-কর্মের তালিকা এই ছোট পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা আগেই বলা হয়েছে, তবুও অন্ততঃ তিন-চারটি বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দরকার তাঁর কাজের মূল্যায়ণ আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য।

এক) আজকের রাজারহাট- নিউটাউন শহর (যা শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত করা হয়েছিল পূর্বের বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা) গড়ার নেপথ্যে অশোকবাবুর অবদান কম মানুষই জানেন। বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তাই ছিল মূল কলকাতা শহরের চাপ কমাবার জন্য যেভাবে শ্রদ্ধেয় বিধান রায়ের চিন্তা-ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিধাননগর (সল্টলেক) উপনগরী গড়ে তোলা হয়েছিল, তেমনই পূর্ব কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাটে আরো বড় আধুনিক পরিকল্পনাযুক্ত নতুন উপনগরী গড়ে তোলা। সেকাজে ঝাপিয়ে পড়লেন রাজ্যের তৎকালীন আবাসন মন্ত্রী। এত বিস্তীর্ণ এলাকায় নিঃশব্দে জমি অধিগ্রহণ করা, সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করা, নিকাশি নালাগুলোর উপর ছোট ছোট ব্রিজ তৈরি করা, বিদ্যুৎ লাইনটানা, ভেড়ি বোজানো ও মাটি ভরাট করা যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনই সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল এসবের জন্য প্রচুর অর্থসংগ্রহ করা। আগেই বলেছিলাম, রাজ্যকে বঞ্চনার এক পরম্পরার পাশাপাশি নানা প্রগতিশীল কাজে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থ যোগানের ফলস্বরূপ কোষাগারের অবস্থা খুব একটা অনুকূল ছিল না। মন্ত্রীমহোদয় নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ঘুরে হন্য হয়ে পড়লেন, বিশেষ করে জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা যোগাড় করার প্রাথমিক চিন্তায়। শেষে এগিয়ে গেলেন অশোকবাবু। টাকার যোগান নিশ্চিত হলো এই করপোরেশন থেকে। উপরোক্ত সব পরিকাঠামো গড়ার বিষয়ে আমরাই এগিয়ে গেলাম অশোকবাবুর নেতৃত্বে। বাকিটা আজ ইতিহাস। গড়ে উঠলো আজকের ভারতের এক আধুনিক গর্বের উপনগরী—নিউটাউন, কলকাতা।

দুই) ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রাজীব গান্ধী এবং শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু মিলিতভাবে তখন হলদিয়ায় পূর্বভারতের প্রথম পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা ও হাবের উদ্বোধন সেরে ফেলেছেন। বেসরকারি উদ্যোগ। টাটা এবং রাজ্যসরকারের বিনিয়োগ থাকলেও তা যৎসামান্য। টাকার অভাবে চালানো যাচ্ছে না কারখানা। অগতির গতি অশোকবাবুর সৌজন্যে আমাদের কোম্পানি। রাজ্যের শো-কেস প্রকল্প, টাকার অভাবে চলবে না, তাতে কোম্পানির বড় ক্ষতি হোক রাজ্যের সরকারের আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে। যদিও ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী তবুও এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের মানচিত্রে অশোকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি এবং করপোরেশনের ভূমিকা আগামী প্রজন্ম ভুলে যেতে পারেন না। উনি বরাবরই খরচ কমানোর লক্ষ্য রাখতেন। কোম্পানি চালানোর

নিয়মিত খরচ অন্যান্য সংস্থার তুলনায় কিছুই নয়। সামান্য কর্মচারী। তাদের মাইনেও অন্যদের তুলনায় বেশ কম। গাড়ি-ঘোড়ার রমরমা নেই। শুধু ড্রেসকোড থাকবে, সবাইকে কোর্ট-টাই পরে কেতাদূরস্ত কর্পোরেট কালচারে অভ্যস্ত হতে হবে। টেকনোলজির পুরো সাপোর্ট নিতে হবে। বাদবাকি সামান্য খরচে চলে যাবে। কিছুদিন অল্প লাভ করতে হবে, কারণ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের মদত দিতে হবে'—এই তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্য।

তিন) টাটার সিঙ্গুরের কারখানা পশ্চিমবাংলায় হয়তো এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতো। দ্বিভক্ত বাংলায়ও পারবাংলার ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণার সাথে সাথে এই বাংলার কোটি কোটি বেকার যুবকের আবার নতুন স্বপ্ন দেখা শুরুর সম্ভাবনা দেখা দিল। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হলো। টাটাগোষ্ঠী খুব ন্যূনতম (অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যা বেশি গ্রহণযোগ্য, আমার মতে) শর্ত দিলেন। জমি অধিগ্রহণ করে দেবে রাজ্য। ক্ষতিপূরণ রাজ্যই দেবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণও কম নয়। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আবার সেই আমাদের সংস্থার সহায়তার প্রসঙ্গ এল। রাজ্যের অনুরোধে এই প্রকল্পের নোডাল এজেন্সি-রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমকে আমাদের প্রচুর ঋণ দিতে হবে। আমাকে অশোকবাবু এবং তখনকার অধিকর্তা বললেন শিল্পোন্নয়ন নিগমের এমডি-র সাথে দেখা করতে। এমডি-র সাথে দেখা করে প্রকল্পের কাগজপত্র চাইলাম। উনি বললেন, আমরাই পাইনি। এটা পাওয়াও সম্ভব নয় এখন।' বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে অশোকবাবুকে জানালাম। উনি সব শুনে আমার সামনেই রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীকে ফোন করে সবকিছু জানালেন। মন্ত্রী ফোনে কী বললেন তা আমি জানতে পারিনি।

ফোন রেখে অশোকবাবু বললেন, আজ তোমাকে কিছু বলবো না। মন্ত্রীর সাথে রাত্রে দেখা করে আগামী কাল বলবো। আমি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে চুপ থাকলাম। পরদিন আমাকে সবকিছু বললেন এবং পরামর্শ দিলেন এসব কথা কেউ কোনদিন জানবে না। এখন রাজ্যের পরিস্থিতি যা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম এবং বিরোধীদল যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে তাতে সরকারের এবং টাটাদের আভ্যন্তরীণ বক্তব্য এখনই প্রকাশ পেল না বুঝে বা রাজনৈতিক কারণে ওরা হৈ-হট্টগোল শুরু করে দেবে, তাতে আর যাইহোক এই বিরাট সম্ভাবনা অংকুরে বিনষ্ট হবে। রাজ্য অন্ধকারে চলে যাবে। আমি শুনে থম মেরে গেলাম। যুক্তিযুক্ত অবশ্যই। তারপর উনি বললেন, কাগজগুলো তোমার কাছে রাখো। আমাকেও সবটা মন্ত্রী দেননি।

সহকর্মীর প্রতি সততা আর অটুট বিশ্বাস এবং রাজ্যের প্রতি মমত্ববোধ দেখে প্রায় চোখে জল এসে গেছিল। আমার কাজ হয়ে যাবার পর সরকারি অত্যন্ত গোপন কাগজগুলো ফেরৎ দিয়ে দিই ওনাকে। ঋণ প্রদানের পরে সত্যিকারের অবস্থা বুঝলাম। আজও জানিনা সাংবাদিককূল কী করে জানতে পারলো যে কাগজগুলো আমি দেখেছি। প্রথমত আমাকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে চেনার প্রশ্ন ছিল না। ব্যক্তিগত ফোন

নম্বারও জানার কথা নয়। বড়বড় সংবাদপত্র দপ্তরের সাংবাদিকরা আমার বেশ অনেকদিন রাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

এহেন অশোকবাবুকে আবার শুধুমাত্র কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দেখার কাজে পার্টি সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন সব সময়ের জন্য। ওখানে ওনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমাদের করপোরেশন ছেড়েই দিতে হলো। আমরা নেতৃত্বহীন হলাম দীর্ঘ সময় ধরে এবং বিশেষ এক কঠিন অবস্থার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে যাবার সময়ে। আগেই বলেছি, বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কোনকিছুতেই থেমে থাকতে চান না। সব সময় এক অতৃপ্ত বাসনা থেকেই যায় তাঁদের মধ্যে। একটা কাজ সম্পুর্ণ করার পর আরেকটা নতুন কাজে হাত দেওয়াতেই ওনাদের আনন্দ। উনি আমাদের সংস্থাকে পুরোপুরি রাজ্যের অধীনস্থ একবৃহদাকার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করতে চাইছিলেন। অনেক উপকরণই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল, অর্থাৎ অনেক শর্ত আমরা পূরণ করতে পারতাম। দেশের প্রখ্যাত এক পেশাদারি সংস্থাকে নিয়োগ করার চেষ্টা হল প্রজেক্ট রিপোর্ট বানাতে দেওয়ার জন্য দেশের আইন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অস্বচ্ছ ও অদৃশ্য হাতের কথা মাথায় রেখেও।

অনেক প্রশ্ন, বা্ধা-বিপত্তি আসছিল। আমরা সামলাচ্ছিলাম, কিন্তু যেগুলি আমাদের আয়ত্তের বাইরে সেটা অশোকবাবু দেখছিলেন। এমতাবস্থায় উনি ছাড়তে বাধ্য হলেন। ওনার অগোচরে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার বৃথা চেষ্টা করলাম। কিছু হলনা। শেষে আমিও করপোরেশন ছেড়ে দেবার কথা ওনাকে জানালাম। কিন্তু আমার হাত ধরে বারণ করলেন নানা ভাবে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

চিরকাল মাটির সংস্পর্শে থাকা আধুনিকমনষ্ক ব্যক্তি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, যা থেকে আমরা বহু প্রাকৃতিক শিক্ষা নিতে পারি। তার সব উল্লেখ সম্ভব নয় এখানে। ওনার সম্পর্কে শুধু একটা আক্ষেপ থেকে গেছে আমার। সাম্যবাদী আন্দোলনের সাথে সামাজিক ন্যায় এবং সমবায় আন্দোলনের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। অন্য অনেকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলতে পারি ভারতের সমবায় আন্দোলনের সাম্প্রতিক মুহূর্তের অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব এবং এই রাজ্যের সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতা আন্দোলনের জনক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা যদি রাজ্যের সমবায়ের মুখ হিসাবে দেখতে পেতাম, তাহলে এই রাজ্যে সমবায় আন্দোলন আরো অনেক, অনেক গতি পেত!

নমস্কার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

—লেখক পেশায় চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের আধিকারিক।

স্মৃতির সরণী বেয়ে : শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনো কিছু লিখতে বসা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা একই ব্যাপার। ১৯৯৯ সালে প্রথম আলাপ হলেও রায়ান স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হওয়ার সুবাদে স্কুলে পাঠ নেওয়ার সময়ই জানতে পারি স্কুলের একজন প্রাক্তন শিক্ষককে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দুষ্কৃতীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয় এবং তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করে জয়ী হন। পরবর্তীতে বহুবার আক্রান্ত হলেও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সমাজ বদলের লড়াই-এ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমৃত্যু একনিষ্ঠ কমিউনিস্টের জীবনযাপন করে গেছেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি থেকে অভিভাবকত্বের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই শুধু বুঝবেন কেমন অভিভাবক ছিলেন তিনি। আমি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিভাবক হিসাবে শুধু পেয়েছি তা না, প্রশাসক ও সমবায়ী এবং লেখক হিসাবেও তাঁর কাছে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল।

দীর্ঘদিন পাশে থাকার সুবাদে অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেও, স্মৃতি থাকলেও

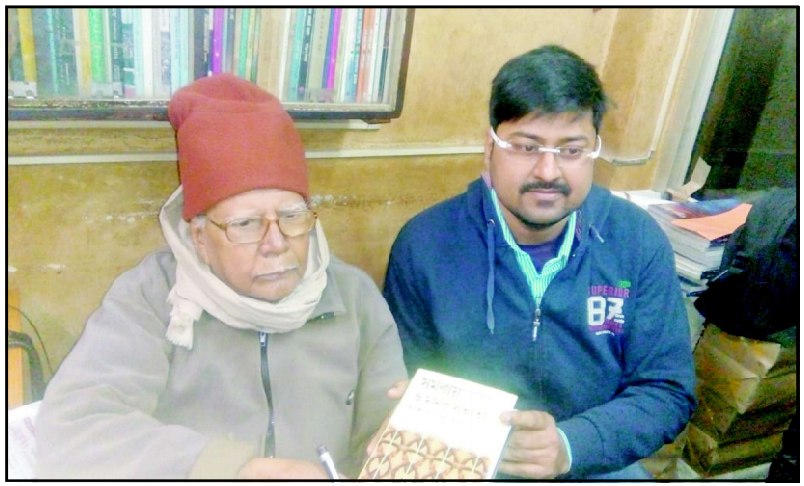

লিখে তা বলা সম্ভব নয়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত শ্রীধরপুর সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সাথে যুক্ত থেকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির শিরোপা তুলে দিয়েছিলেন শ্রীধরপুর সমবায় সমিতির মাথায়।

১৯৮৫ সাল থেকে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হন এবং ১৯৯২ সালে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পায়। বর্ধমান জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং গ্রামীণ সমবায়গুলি গ্রামীণ উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করে একের পর এক গ্রামে এলাকাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং সমবায় আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায় সারা জেলা তথা রাজ্যে।

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে প্রবেশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দীর্ঘদিন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে ছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সহ ১৭টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক, RBI, NABARD, COOPERATION DEPT., AUDIT DEPT.-এর মধ্যে সমন্বয় না হলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সমবায়েরও অগ্রগতি ঘটাবে না। তাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে চালু হল CCB CONFERENCE, যা আজও চালু আছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করলেন রাজ্যের কিছু Urban Co-operative Bank বন্ধ হতে চলেছে, ধুঁকছে এবং তিনি সাথে সাথে রাজ্য সরকার এবং অর্থমন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে ওই ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি মূলধনী সহায়তা দিলে ব্যাঙ্কগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় রাজ্যের টাস্ক ফোর্স এবং সারা রাজ্যের মানুষ লক্ষ করেছিল ব্যাঙ্কগুলি কীভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

১৯৯৯ সাল থেকেই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম্পিউটারাইজেশন প্রয়োজন এবং তখন থেকে শুরু করে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে চালু করেন কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে এ.টি.এম পরিষেবা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান যে সমবায় আইনের উপর ভিত্তি করে সমস্ত সমবায় পরিচালিত হচ্ছে (WBCS ACT 2006, Rule 2011) তার গঠনেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিধি শুধু জেলা বা রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। প্রথম বাঙালি হিসাবে NAFSCOB (National Federation of State Cooperative Banks)-এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Asian Development Union-এর সচিব পদেও ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। Asian Country -এর বিভিন্ন সমবায়ীদের সাথে নিত্য যোগাযোগ ছিল অশোক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সমবায়ের মধ্যে সমবায়ের ভাবনা নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, মহিলাদের নিয়ে সমবায়ের গোষ্ঠীগঠন এবং সান্ধ্য বৈঠকের মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগী হন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে সমবায়ের ভাবনা এবং এই সমবায়ের ভাবনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহম্মদ ইউনুস ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগমের সভাপতি হিসাবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমবায়ের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ভারত সরকার দ্বারা 'সমবায়রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত হন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন অশোকবাবু। বয়স কখনো ওনাকে আটকে রাখতে পারেনি, রাজ্যে ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর অশোকবাবুকে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে, বর্তমান শাসক দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী সহ বিভিন্ন সমবায়ের পরিচালকমণ্ডলীকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে সরানোর চেষ্টা হলেও অশোকবাবু রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সাথে নিয়ে একের পর এক মামলা করে জয়লাভ করেছেন এবং সমবায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

কাছ থেকে দেখেছি অসুস্থ শরীর নিয়ে কীভাবে তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে যুক্ত করে 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন!

তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' বইটি সমবায়প্রেমী মানুষ সহ সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বই লেখার সময় অনেকদিনই ওনার সাথে থেকে দেখেছি কতটা পরিশ্রম তিনি করেছেন, কত রাত জেগেছেন এবং সহধর্মিণী হিসাবে গৌরী জ্যেঠিমা কীভাবে পাশে থেকেছেন।

বই প্রকাশের দিন কলকাতা বইমেলায় ওনার পাশে থেকে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু আমলা থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি উপস্থিত থেকে ওনাকে উৎসাহিত করেছেন। NABARD সহ RBI-এ ওনার গতিবিধি ছিল অবাধ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে পরামর্শ দিয়ে তিনি সহায়তা করেছেন এবং দলমত নির্বিশেষে ওনার পরামর্শ নিয়েছেন অনেকেই।

ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক দলের সরকার গঠনের পরই একের পর এক সমবায়গুলি জোর করে দখল করতে উদ্যত হলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পাওয়ার সাথে সাথেই যোগাযোগ স্থাপন করেন সেখানকার সমবায়ের নেতৃত্বের সাথে এবং তাঁর সুপরামর্শে অগণতান্ত্রিক আক্রমণ কিছুটা হলেও প্রতিহত করা যায়।

২৯ মার্চ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার সাথে সাথে একজন অভিভাবককে হারিয়েছি। তাঁর সুপরামর্শ থেকে হয়তো বঞ্চিত হব কিন্তু তিনি সমবায়ের যে পাঠ

দিয়ে গেছেন সেটাকে পাথেয় করে সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজ্যে অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের মাধ্যমে আমরা সকলে মিলে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবো।

লেখক : বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন-এর যুগ্ম সম্পাদক

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাকলী গায়েন

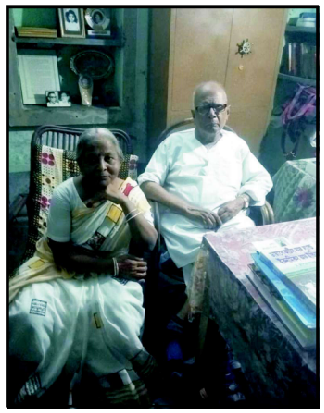

দাদা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌদি, কমল গায়েন আর স্নেহের তোতা। আমরা আমি সহ ৫জন কী আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছি। আজ ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে দু'জন হয়ে গেলাম। প্রথমে তোতা, তারপর কমল গায়েন। দেশে যখন করোনা, চতুর্দিকে হাহাকারে-ক্রন্দনে-হতাশায়, কাজ হারানোর যন্ত্রণা, না-খেতে-পাওয়ার যন্ত্রণা আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্য চেষ্টা, সেই সময় আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি আর বৌদি রেখে এলাম—চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজে লাগবে এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে দেহদান করা হল। প্রচার-বিমুখ হয়ে চিরকাল বেঁচে এসে নীরবে চলে যাওয়া—এ যেন আমার ও বৌদির কাছে বটছায়া থেকে রাস্তায় নামার মতো হলো। হে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, ভারতজোড়া যাঁর নাম আলোড়িত হওয়া দরকার ছিল, করোনার গ্রাসে নিঃশব্দে তা ঘটলো। কত স্নেহময় কথাবার্তা আজ মনে পড়ছে। কিন্তু মন ভারাক্রান্ত, হাতে কলম সরে না। কিন্তু দিনেশকে বললাম, জানো কিছুটা লেখা হলেও বাকিটা শেষ করতে পারছি না। দিনেশ ছোট ভাইয়ের মতো বললো—তোমাকে লেখা দিতে হবে। তুমি পারবে। শেষ করো।

সেই ১৯৮০ সালে কোন একদিন এই পরিবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি—এক পরিবারে তারপর কত সুখকর ঘটনা ঘটে চলেছে। ভাবলাম এমন ভাবে চলে যাবে। মাঝে ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই দাদা ও বিশ্বেশ্বর রায়ের প্রয়াসে আমি কাকলী রায় থেকে হয়ে গেলাম কাকলী গায়েন। এ পাওয়া আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তারপর দিন যে একই গতিতে যায় না ধীরে ধীরে বুঝলাম। প্রতিবছর বেড়াতে যাওয়া—সে যেন সুখকর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় বাঁধানো থাকবে এবং ফটোগুলো সাক্ষী হয়ে রইল। দাদা- বৌদির স্নেহছায়াতে দিনগুলো চলছিল। কিন্তু সময় বড়ই নিষ্ঠুর। একই গতিতে চলতে দেয় না। বিপদ হয়েছে, কারুর জন্য ছুটতে পিছপা হননি। পাশে দাঁড়ানো, বোধ করি আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ। কোনো দ্বিধা না রেখে গরিব

মানুষের পাশে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছেন আমাকে। যে-ই কোনো সমস্যা নিয়ে এসেছে তার সমাধান কীভাবে করা যায় তা বাতলে দিতেন। সে ডাক্তার দেখানো, কলকাতায় পাঠানো, না খেতে পাওয়া, অসুস্থ হয়ে রোজগার বন্ধ, মেয়ের বিয়ে—সবেতে যেন দরাজ হাতে সমাধান করেছেন। যা আমার নিজের চোখে দেখা। আর তাতে মানুষের প্রতি আরও সহমর্মিতা প্রেরণা জুগিয়েছেন। দাদা ও বৌদি, আর আমার সহধর্মী কমল গায়েন। তাঁদের অতীত আমার মর্মে স্পর্শ করতে করতে কখন যেন আমি অংশীদার। তাই তোতা আমার মেয়ে হয়ে উঠতে পেরেছিল। বন্ধু, দিদি, হয়ে যেন ও মনের কথার অংশীদার। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। ওর শেষ কথা, 'কাকলীদি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো' আজও আমার কানে বেজে ওঠে। কিন্তু হাসপাতাল, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সবই হলো। ১৮ সেপ্টেম্বর তোতার নিথর দেহ নিয়ে ফিরলাম। এ যন্ত্রণা যেন কোনো মানুষের না ঘটে। মনকে শক্ত করে আমরা ৪ জন চলছিলাম। কিন্তু সময় নিষ্ঠুর। ২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল জল্লাদবাহিনীর দল। শেষ দেখা নিথর দেহ কমল গায়েনকে। শেষ কথা আর হলো না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনে হয়েছিল এর বিচার হবে না। প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে শেষ করে সদর পার্টিকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা বিরোধী দলের। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা অন্য ধাতুতে গড়া। বিচার হলো না, শাস্তি হলো না কেন? প্রশ্ন রয়ে গেল মনে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কেন আমিও দেওয়ানদিঘির রাস্তায় যেতে পারলাম না—কারণ আমার কাছে কোনো খবর ছিল না। সময়ের সাথে সাথে কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি মিছিলে পা মেলাই। মনে মনে শপথ নিলাম এই কঠিন কঠোর, কাঁটা বিছানো পথে চলতে চলতে শেষ হব কর্মীরা।

তারপর তিন জনের কীভাবে দিন কেটেছে বলার কথা নয়। আমি চলে এলাম মায়ের কাছে, কারণ মা একা থাকেন বাড়িতে। দাদা ও বৌদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি বিক্রি করে চলে এলেন তরুণ রায়ের বাড়িতে। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল। সময়ের সাথে সাথে ওনার শরীরও ভাঙছিল। কিন্তু আশা ছিল ভালো হয়ে উঠবেন। কিন্তু সময় আমাদের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম খেলা খেলে। আমাদের কাছ থেকে আপনাকে নিয়ে রেখে এলাম। আর দেখা হবে না। কিন্তু মন মানে না। বাড়িতে থাকলে মনে হয় নার্সিংহোমে আছেন, ভালো হয়ে আমাদের মাঝে চলে আসবেন। দীর্ঘদিনের জীবনের সাথীকে রেখে চলে গেলেন। তাঁর জীবনের শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। কঠিন শপথ, যতদিন চলা যায় চলবো আমি ও বৌদি আপনাদের অনুপ্রেরণায়। অনেক না বলা কথা বলা হলো না। তবু শেষ প্রণাম, লাল সেলাম।

দাদা কোনো বড় সমাবেশ হলেই আমার, তোতার, লক্ষ্মী, শিপ্রা ও আরও মহিলা কর্মীদের হাতে 'নতুন চিঠি' ধরিয়ে দিতেন—যা বিক্রি কর তোরা। আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে 'নতুন চিঠি' বিক্রি করতাম সভা সমাবেশে। তাই নতুন চিঠিও আমার অন্তরে আছে।

লেখিকা : *প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর পরিবারের অন্যতম সদস্যা।*

কর্মাশোক

দেবেশ ঠাকুর

অশোকদাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারি না। বহুমাত্রিক কোনো মানুষকে তার যাপনের নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে বিচার করা সহজ কাজ নয়। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট সমবায়ী। পত্রিকা সম্পাদক, প্রকাশক সংগঠক। একনিষ্ঠ রাজনৈতিক সেনাপতি। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

ছাত্রজীবন থেকেই অশোকদাকে চিনি। চিনি কথাটি খুবই নৈর্ব্যক্তিক এবং আপেক্ষিক। চিনি এবং জানির মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যি বলতে গেলে, খুব কাছের মানুষকে কি আমরা জানি!

এদিক দিয়ে খুব স্বচ্ছ মানুষ অশোকদা। তন্নিষ্ঠ পার্টিকর্মী। লিও-সাউ-চি না পড়ে অশোকদাকে পড়তে পারলে অনেক কাজ হয়ে যেত। পার্টি এবং তৎ-সম্পর্কিত কোনো মিটিং মিছিল সমাবেশ আলোচনায় অশোক-দার অনুপস্থিতি বিরল ঘটনা। এদিক দিয়ে মনে হয় একজন শাস্ত্রীয় কমিউনিস্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে যখন সরাসরি পার্টির অভ্যন্তরে আসি অশোকদাকে খুব কাছে পাই। বাবুরবাগ শাখার অভিভাবক ছিলেন। এই এলাকার গঠনশৈলী বহুমাত্রিক। মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম পাড়া, পূর্ববঙ্গীয় অধ্যুষিত একটি অঞ্চল, বিস্তীর্ণ বস্তি অঞ্চল এবং মধ্য বাবুরবাগ। অশোকদা প্রায় প্রতিটি মানুষকে চিনতেন এবং জানতেন। মানুষজন তাঁকে খুব কাছে পেতেন। সত্যি বলতে কী, খুব কড়া

মাপের অভিভাবক ছিলেন না। বস্তুত শাখাটির নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। প্রায়ই নিরুপম সেন মদন ঘোষকে আসতে হতো ঝামেলা মেটাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল বিপ্লব আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব বিঘৎখানেক। কিছু স্থবির তাত্ত্বিকের জন্য সেই কাজটা হয়ে উঠছে না। অশোকদা বোঝানোর চেষ্টা করতেন, কেতাব ও কৃত্যের মধ্যে সঙ্গতি অসঙ্গতি। খুব আপনজন মনে হতো মানুষটিকে। গণনাট্য গড়ে উঠলো। অশোকদা গৌরীদি আগে নাটক করেছেন 'অন্বেষা' গ্রুপে। অশোকদার মেয়ের নামে গ্রুপ। মৃদুল সেন স্বপ্না সেন আছেন গণনাট্য টিমে। পরিচালক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ধীরে ধীরে একটি পরিবার হয়ে উঠলাম। আমার তখন মেস বাড়িতে মেষ-বৎ জীবনযাপন। তখন এই নাট্য পরিবারকে ঘিরে অদ্ভুত ভালোলাগা। কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন প্রত্যেকে। আমার সংস্কৃতি যাপনে এঁদের কাছে আকণ্ঠ ঋণ।

একদিনের কথা মনে আছে। রবীন্দ্রভবনে নাটক হবে 'দেনা পাওনা'। মৃদুলদার নাট্যরূপ। অমলদার পরিচালনা। অশোকদা একটি ভৃত্যের চরিত্রে আছেন। সবার মেকাপ হয়ে গেছে। তৃতীয় ঘন্টার জন্য অপেক্ষা। সবাই নিশ্চিত, সমবায়ের অতিব্যস্ত চেয়ারম্যান ভৃত্যের চরিত্রের জন্য আসতে পারবেন না। বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত তাগাদা দিচ্ছেন, চেয়ারম্যান আসবেন না।' তোমরা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নাও। নাটক শুরু করতে যাব এমন সময় গাড়িতে অশোকদা হাজির। ঢোলা পাজামা ফৎ ফৎ করতে করতে। সোজা মেকআপ-ম্যানের কাছে হাজির। ড্রেসার-এর কাছে অবশিষ্ট আর ড্রেস ছিল না। একটি রাজবেশ পড়ে ছিল। অশোকদা নির্বিকার। হাতে গড়গড়া। সংলাপ বিশেষ নেই। প্রস্থানের ইচ্ছাও নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে মঞ্চের আলোয় উপস্থিত থেকে কলকেতে ফুঁ দিয়ে মঞ্চকে ধূমায়িত করে অবশেষে নিষ্ক্রমণ। নাটক যেমনই হোক অশোকদা উৎসাহিত করতেন, চমৎকার হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতিতে অন্যকে স্বীকৃতি দিতে স্বাভাবিক কৃপণতা তাঁর ছিল না। শতফুল বিকশিত হোক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

বসুধৈব কুটুম্বকম্—এই তত্ত্বটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টি কমরেডদের আত্মজন মনে করেছেন। বিশ্বাস তাঁর অন্তরের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। সাতের দশকে প্রবল শারীরিক আঘাত পেয়েছেন। হাড়গোড় সব ভাঙা, কিন্তু বিশ্বাসে অবিচল। মুখে আমাদের কমিউন। বাস্তবে দু-তিনজনের সুখী পরিবার। অশোক-দার বাড়িতে সপরিবার কমল গায়েনের আশ্রয়। আশ্রয়ের সঙ্গে আশ্রিত বলতে হয়। কমল গায়েন আশ্রিত নন। পরিবারের একজন। তোতার অকালমৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েন অশোকদা। আর কমলদা যেদিন শহিদ হলেন অশোকদার অন্তঃকরণ, বুকের পাঁজর যেন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কমলদার সঙ্গে নৈকট্যের কারণে আমি সুভাষপল্লীর বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় গ্রামের বাড়িতে গেছি একাধিকবার।

তোতা মা-বাবার কাছে সমন্বয়ের বার্তাটি গভীরভাবে অনুশীলন এবং গ্রহণ করেছিল। অত্যন্ত সংবেদনশীল, মিতবাক, সুজন তোতার মৃত্যু আমাদের মতো সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই সময় বর্ধমান শহরের সকল নাট্যদল মিলে 'অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ' নামে একটি যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলি। অশোকদা-গৌরীদির সঙ্গে কমলদা এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর উৎসব এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কালের আবর্তে সংস্থাটি গতি হারায়। দু হাজার এগারোর পর অনেক চোরাবালি, বিশ্বাসভঙ্গ, অস্থিরতা বিপন্নতা বয়ে আনে। সপরিবার অশোকদা কিন্তু অবিচল।

সুভাষপল্লীর বাড়ি বিক্রি করে ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে উঠে আসেন সর্বমঙ্গলাপাড়ায়। মাঝে মাঝে গৌরীদির সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেক কিছু হারিয়েছেন। বিশ্বাস হারাননি।

অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে দেখতে গিয়েছেন। সমবেদনা জানিয়েছেন পরিবারকে।

অশোকদার চলে যাওয়া এক কালবেলায়। বিশ্ব অবরুদ্ধ। মানুষের চোখে মুখে আশঙ্কা। পিতা তার সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে পারে না। সন্তান দেখে তার পিতার লাশ হুক দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে গাড়িতে। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ। ভাগ্যিস অশোকদার মরণোত্তর দেহ দান করা ছিল!

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

লেখক : *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, লেখক।*

এক হার না-মানা মানুষের কথা

গীষ্পতি চক্রবর্তী

১৯৮১ অথবা ১৯৮২ সাল নাগাদ অশোকদা (অশোক ব্যানার্জী)-র সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। পরিচয় কিভাবে, কোথায় হয় তা মনে পড়ে না। তখন আমি ছাত্র। আমার সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দেন আমার এক সহপাঠী। বর্ধমানের অনেক সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষদের একজন অশোকদা। বর্ধমান শহর ও গ্রামের বহু গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় সে সময়ে। এঁদের মধ্যে নিরুপমদা (নিরুপম সেন) ও মদনদা (মদন ঘোষ), সুভাষদা (সুভাষ চ্যাটার্জী) ও আরও অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নানা কাজের মাধ্যমে। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হওয়ার সুবাদে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, জহুরদা (জহুর আলম) ও দিনেশ (দিনেশ ঝা) ও আরও অনেকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। বর্ধমান শহর, গ্রামকেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ডে এইসব গুণীজনের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব অশোক ব্যানার্জী, 'নতুন চিঠি'-র প্রাণপুরুষদের একজন। হাজার কাজের মধ্যে ওনাকে দেখেছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন একসময়ে। চাকরি ছেড়ে দেন মাঝপথে। ওখানেও নানা কর্মকাণ্ডে উনি ছিলেন সচল ব্যক্তিত্ব। অবাক হয়েছিলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে ওনাকে দেখে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়ের কর্মসমিতির মৃদুলদা (মৃদুল সেন) ও দিলীপদা (দিলীপ দুবে)-র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন উনি। ওনাদের নানা কাজে দেখেছি, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসার বন্ধনে। যে বন্ধনের উপস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই কম। হয়তো এই যুগের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে ওনাদের সম্পর্কের গভীরতা মাপা ঠিক হবে না। এই ব্যাপারটা অন্য আলোচনায় ভূমিকা হতে পারে।

বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের আলোয় অশোকদাকে না দেখলে, বহু কাজের মধ্যে দিয়ে ওনাকে না দেখলে, দেখাটা হয়তো সঠিক হবে না। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ওনার জীবনের এক বিরাট ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এই কর্মকাণ্ডে চলার পথে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝায় গৌরীদি (গৌরী ব্যানার্জী, ওনার সহধর্মিনী) ওনার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সময় অশোকদাকে নিয়ে চলে গেছে অজানা জগতে। জীবনের মাঝপথে ওনারা হারিয়েছেন ওনাদের একমাত্র মেয়েকে। জীবনের ওই কঠিন সময়ে ওনাদের দেখেছি ধীর-স্থির। বেদনাকে নিজেদের মধ্যে ধরে রেখেছেন ওই কঠিন সময়ে। এখন

একা লড়াই করে চলেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গৌরীদি। এখনও হাসিমুখে মানুষের লড়াইয়ের মাঝে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে চলেছেন উনি।

সুভাষপল্লীতে অশোকদাদের বাড়ি ছিল। সে বাড়ি ছেড়ে ওনারা চলে গিয়েছিলেন সর্বমঙ্গলাপাড়ায় বাঁকানদীর ধারে একটি বাড়িতে। ওখানে থাকতে থাকতে বয়সজনিত কারণেও দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগার কারণে অশোকদা বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। গৌরীদি ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সেবা যত্ন পেয়েছেন অশোকদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবনের শেষ কটা দিন ওনার কেটেছে নার্সিংহোমে, অর্ধচেতনায়। করোনা আবহে মানুষের যাতায়াতে বিধিনিষেধ ছিল অনেক। ফলে মানুষের ঢল নামেনি সেখানে। মৃত্যুর পরেও সীমিত মানুষের উপস্থিতিতে ও সহযোগিতায় ওনার দেহ চলে গেল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। মৃত্যুর পরেও নিজেকে বিলিয়ে দিলেন; সে ব্যবস্থাপনা করে গিয়েছিলেন। প্রচারবিমুখ একজন লড়াকু মানুষ চলে গেলেন প্রায় নীরবে। যখন মাঝে মাঝে ওনাকে দেখতে যেতাম, কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে বলতেন—তোমাকে বিরক্ত করছি বারে বারে। অবাক হতাম। আমারা জানাতাম, উনি বলামাত্র বহু মানুষ বিনাপ্রশ্নে চলে আসবে ওনার কাছে। আজকের সমাজের আশ্চর্য আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাপ্তির বিপরীতে সেইসব মানুষেরা নীরবে ওনার পাশে থাকার চেষ্টা করেছে, যাঁরা ওনাকে কাছে থেকে দেখেছে, প্রভাবিত হয়েছে ওনার আদর্শের দ্বারা।

আমাদের পঠন-পাঠনের অঙ্গ হিসাবে গ্রামে কিছুদিন থেকে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি সঞ্চালিত হচ্ছিল বর্ধমান মেডিকেল কলেজের তত্ত্বধানে। কলেজের এন.এস.এস ইউনিটও যুক্তছিল এই কাজের সঙ্গে। বর্ধমানের বোহার অঞ্চলে, বড়েঞা গ্রামের পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আমরা থাকতাম। প্রায় সাত দিন আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করতাম। আমরা যেখানে কাজ করতাম, তার কাছেই ছিল শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ-এর কাজের ক্ষেত্র। এই কো-অপারেটিভের কাজের সঙ্গে ছিল অশোকদার নিবিড় যোগাযোগ। সে সময়ে ওই সমবায়ের কাজ চলছিল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। এই সাফল্যের পেছনে অশোকদার ভূমিকা ছিল বলবার মতো। উনি নিজমুখে কোনোদিন বলেননি এসব কথা। আমরা জেনেছি অন্য অনেকের সঙ্গে আলাপচারিতায়। আড়ালে থেকে কাজ করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ওনার। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের সামনের সারির পথপ্রদর্শক ছিলেন অশোক ব্যানার্জী। সমবায়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ওনাকে চেনে একডাকে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ভালোভাবে বলতে পারবেন ওনার কার্যপরিসর। ওই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো সুযোগ ছিল না আমাদের। ফলে দূর থেকে শুনে যতটুকু বুঝেছি, তা থেকে বলা যায়, বিভিন্ন সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ভরসার জায়গা ছিলেন উনি।

বামপন্থী রাজনীতির অঙ্গনে অশোকদার ছিল স্বচ্ছন্দ চলাচল। বহু সময়ে নতুন চিঠি পত্রিকা অফিসে ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। পত্রিকা পরিচালনায় জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ও আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দেখেছি ওনাকে। কখনো জটিল দার্শনিক তত্ত্বের গভীর আলোচনায় ওনাকে খুব একটা কথা বলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে অল্প কথায় মত প্রকাশের ক্ষমতা, সকলকে যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলায় পটু ছিলেন উনি। দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ওনার। শুনেছি জেলে থাকার সময়ে, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে উনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। রাজনীতির কথা উঠলেও, নিজের জেলের অভিজ্ঞতার কথা কখনও সোচ্চারে বলতে শুনিনি। মানুষের ওপর আস্থা হারানো ঠিক নয়, খুব মৃদুভাবে এইটুকুই কথা বলতেন, কেউ ধৈর্য্যচ্যুত হলে। এতকিছু করলেন, কি হল? এমন প্রশ্নে ওই একটি উত্তরই দিতে শুনেছি ওনাকে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক কৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অশোকদার মতো মানুষেরা সেইসব বিরল প্রজাতির প্রতিনিধি, যারা রাজনীতি থেকে নাম, যশ, প্রচার, কাগজে, টিভিতে মুখ দেখানোর নতুন ধারার সঙ্গে বেমানান। রাজনীতির যে ঘরাণা অশোকদা ও ওনাদের মতো মানুষেরা তৈরি করেছিলেন, বর্তমান প্রজন্ম হয়তো তার সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয়; হয়তো নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উঠে আসছে, যা পুঁজিবাদের ভোগসর্বস্ব জীবনধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইছে ও মানুষকে ভোগসর্বস্বতার ঘূর্ণাবর্তে টেনে নিতে চাইছে। দলগত রাজনৈতিক ধারাকে দূরে সরিয়ে রেখে এটুকু বলা যায়, বাম-রাজনীতি ও বাম-বিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা, সকলের কাছেই অশোকদাদের রাজনৈতিক ঘরাণা ভাবনার উদ্রেক করবে। যেকোনো

রাজনৈতিক দল তাদের কর্মকাণ্ড রূপায়ন করে মানুষের হাত দিয়েই। মানুষের জন্য কাজ করার পদ্ধতি প্রকরণ কেমন হওয়া উচিত তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অশোকদার মতো মানুষ। এই সময়ের আর্থ-সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীর স্থির থেকে আগামীদিনের কাজ কিভাবে করতে হয় তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন উনি। ভবিষ্যতের কাজ খুব সরবে হয় না। এক নীরব কর্মধারা সেই কাজের পদ্ধতি। যারা সাহসে ভর করে সেই কাজে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারবেন, তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন অশোকদার কাজের ধরণ।

রাজনৈতিক মতাদর্শে যারা বিরোধী, তাদেরকেও দেখেছি ওনাকে শ্রদ্ধা করতে। ব্যক্তিগত সমালোচনা করতে শুনিনি কখনো ওনাকে। সাহায্যের হাত বাড়াতে উনি কখনো রাজনৈতিক দলের পরিচয়কে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না।

ডায়াবেটিসের কারণে ধীরে ধীরে চোখের ক্ষমতা কমেছিল অনেকটা। চিকিৎসার সমস্ত নিয়ম ঘড়ি ধরে মেনে চলতেন। খাওয়া ছিল চিকিৎসা-বিধি মেনে। শত অনুরোধেও বিচ্যুত হতেন না নিয়ম থেকে। কিডনির সমস্যাও ছিল কিছুটা। এই সবকিছু নিয়েই কাজের ধারায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। কখনও আক্ষেপ করেননি। শরীরের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে টপকে মনের জোরে চালিয়ে নিয়ে গেছেন নিজেকে। গড়পড়তা জীবনের ছাঁচে ফেলা যাবে না ওনাকে। সমাজ যা কিছু চাপিয়ে দেয় আমাদের মনে, আমরা বেশিরভাগ মানুষ তাইই মেনে নিই। ভাগ্য শব্দটা বেশিরভাগ মানুষকে ভাবনার, চিন্তার, বিশ্লেষণের শ্রম থেকে দূরে রাখে। চিন্তার জগতে কঠোর শ্রমের ক্লান্তি কাবু করতে পারেনি ওনাকে। ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়ার চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে ছিল ওনার অবস্থান, শেষ দিন অবধি।

হয়তো কিছু মানুষের মন ওনাকে মেনে নিতে পারেনি। জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতা মানতে অনেকের কষ্ট হয়। ভাগ্যকে আশ্রয় করে একরকমের এলোমেলো চিন্তায়, অনিশ্চিতের বাস্তবতাকে এই সমাজের ঘোর এক অসুখ হিসাবে না দেখে একরকম করে জীবন কাটায় বেশিরভাগ মানুষ। এরই মাঝে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিচ্ছেন অশোকদারা। অনেকের কাছে এইসব মানুষেরা দূরের মানুষ। বহু যুগ ধরে এঁরা একধরনের অবহেলাকে মেনে নিয়েছেন। যদিও এঁদের শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় মনে রেখেছেন অনেকে। এই সংখ্যার হিসাবটা আজ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জন্য যে স্বাধীনতার কথা বলতে ভালোবাসতেন অশোকদা, সে কথা শোনবার, বুঝবার, বিশ্বাস করার মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে ততই স্বাধীন জীবনের সুদিনের কাছে হয়তো পৌঁছে যাব আমরা; বাস্তবে কি হবে, তা অনেক যদি, কিন্তু, জটিল হিসাব-নিরাশের ওপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎবাণী এই আলোচনার পরিসরের বাইরে। অশোকদারা একভাবে চেষ্টা করে গেলেন। নতুন প্রজন্ম হয়তো নতুনভাবে কিছু ভাবছে। ভাবনার বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা দূরে চলে গেলেও, নতুন চারা বেরোবেই এটুকু জোর দিয়ে বলা যায়। প্রকৃতির নিয়মেই এই ঘটনা ঘটবে।

লেখক : *বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

সাধারণ বেশভূষায় এক অসাধারণ কর্মোদ্যোগী

নন্দনকুমার বসু

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ চেহারার আড়ালে একজন দৃঢ়চেতা ও মাটির কাছাকাছি মানুষ। যিনি মানুষের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কমিউনিস্ট আদর্শে আত্মনিবেদিত। তিনি আমাদের মতো অনেক পরিবারেরই আপনজন ছিলেন। তাঁকে আমার কাকু বা কাকা বলা উচিত ছিল—কারণ তিনি আমার বাবা বাসুদেব বসুর সহকর্মী ছিলেন। আবার একই ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। আবার আমার নিজের দাদা চন্দন বসু-রও সহকর্মী ছিলেন। আর এক দাদা প্রয়াত শ্যাম বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন। আমার বাবাকে উনি 'দাদা' বলতেন। তাই অনেক ছোটবেলা থেকেই আমি ওনাকে দেখেছি।

রাজনৈতিক আদর্শবোধে একজন মানুষ কতবড় মানবতাবাদী হয় তা যাঁরা ওনার সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরাই জানেন। নিরহঙ্কারী এই মানুষটিকে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়তে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মনোবল দৃঢ় থেকেছে। বলতেন—"আদর্শের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে আদর্শ ত্যাগ করা যায় না।"

সমবায় আন্দোলনের তিনি বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাথমিক সমবায় সমিতি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে সমবায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবিষয়ে আমি যাচ্ছি না। আমি সর্বশেষ যে প্রতিষ্ঠানে ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম, সেই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রশাসক হিসেবে আমি যা দেখেছি তার কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। ৮০-র দশকের শেষের দিকে ডাব্লুবি.এফ.সি-র বোর্ড অব ডাইরেক্টরের একজন সদস্য হিসেবে সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি রূপে প্রথমে তাঁকে দেখি। নাক উঁচু প্রতিষ্ঠান সাধারণ বেশভূষার এক অতিসাধরণ অথচ বিনয়ী এই মানুষকে দেখে খুব একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু খুব স্বল্প সময়েই এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে বোর্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। তৎকালীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও সিনিয়র আই.এ.এস চেয়ারম্যানদের সামনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রকল্প গড়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামকে বিশাল উচ্চতায় নিয়ে যান।

অসম্ভব সৎ ও বিনয়ী অথচ কঠোর এই মানুষটির সঙ্গে থেকে এক অভিজ্ঞতাকে এখানে বলার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না। আমি অশোকদার সঙ্গে ডব্লু.বি.এফ.সি-র একটি স্পেশাল ইন্সপেকশনে দীঘা যাই। সেখানে একটি বিশাল হোটেলে পাশাপাশি দুটি ঘরে আছি—সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে বিছানা পরিষ্কার করার সময় দেখি একটি মানিপার্সে বেশ কিছু টাকা বিছানার নীচে রয়েছে। অশোকদাকে বলা মাত্র উনি বললেন, এদের প্রধান অফিসে ফোন করে বলো—আমরা এই মুহূর্তে হোটেল ছাড়ছি। এবং সেদিন কলকাতায় ফিরে হোটেল মালিককে চরম তিরস্কার করেছিলেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তখন উনি WBFC ও State Co-op ব্যাঙ্ক এই দুটি সংস্থার চেয়ারম্যান। ছুটির আগে আমাকে ফোন করে বললেন— তোমার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত দরকার আছে—তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে যেয়ো না, তোমাকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দেবো। উনি এসে বললেন—কিছু টাকা দরকার। কেউ একজন এসেছেন। আমি কদিন পর মাইনে পেয়ে দেবো। যা বললেন তার চেয়ে কিছু বেশি টাকা আমি দিয়ে এলাম। যথারীতি পরের মাসের শুরুতেই উনি সেই টাকা ফেরৎ দিলেন এবং বললেন—"ওখানে অনেক লোক ছিল, আমি যেহেতু তোমাকে আমার পরিবারের লোক হিসেবে দেখি, তাই অন্য কারো কাছে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না।" ছোট এবং সামান্য ঘটনা, কিন্তু মানুষটির কী সততা এবং নিজেকে সৎ রাখার প্রচেষ্টা তাই বিষয়টি উল্লেখ করলাম। এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে যা এই স্বল্প পরিসরে বলা যাবে না।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের এম.ডি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। আমাদের এম.ডি বিদেশে একটি পোস্ট পেয়ে চলে গেছেন। অফিসে কাজ-কর্মে অসুবিধা হচ্ছে। অশোকদাকে তৎকালীন চেয়ারম্যান অনুরোধ করেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টা যাতে দেখেন। জ্যোতিবাবু তখন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিদেশে গেছেন, প্রয়াত বিনয় চৌধুরী কার্যভার সামলাচ্ছেন। অশোকদা ওনার সাথে কথা বলে তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ আমলাদের সাথে একজন ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করলেন। শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী বললেন, 'জ্যোতিবাবু অনেক সুবিবেচক, উনি না থাকায় আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। সুতরাং তোমাদের অনেক বেশি দায় যাতে ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো বদনাম না হয়। পরে অশোকদা এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হন এবং সারা ভারতে মধ্যে WBFC সুনাম অর্জন করে।

অশোকদা প্রশাসক হিসেবে যে পদক্ষেপ নিতেন তা তো সুদূরপ্রসারী। একটি নামকরা বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থার কথা বলছি। তারা আমাদের আর্থিক সহায়তায় বেশ নাম করেছে এবং আমাদের কাছে আরও ঋণ নিতে চায়। এম.ডি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা সেই ঋণ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি তখন মেদিনীপুরের দায়িত্বে ছিলাম। আমি জানতে পেরে অশোকদাকে জানাই। ওই উদ্যোগীও অশোকদার সাথে দেখা করেন এবং কথা বলে আশ্বস্ত হন। অশোকদা কার্যকরী পদক্ষেপ নেন

এবং বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থা ঋণ পায়। অশোকদার সেদিনের সিদ্ধান্ত ওই সংস্থাকে পূর্বভারতের বৃহত্তর সংস্থায় পরিণত করেছে।

WBFC -তে চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত খরচের জন্য একটি অনুমোদিত পরিমাণ ধরা থাকে, যা অশোকদা কখনোই ব্যয় করেননি। উনি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সর্বস্তরের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর দিতেন। সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে কোনো অন্যায় বরদাস্ত করতেন না। এমনকি আমাকেও তিরস্কার করেছেন। ছোট থেকে বড় সবাইকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। ওনাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

লেখক : *ডব্লু.বি.এফ.সি-র প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক।*

স্বপ্নোজ্জ্বল দিনের এক সেনানী

অরুণ মজুমদার

সেই সময়টা বড় দুঃসময়, বামপন্থীদের বিশেষ করে সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থকদের কাছে। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের খরতাপে দগ্ধ হচ্ছেন সবাই। বর্ধমানেও সেই ঐতিহাসিক উক্তি মুক্তিসূর্যের বর্ধমানে আমাদের পা রাখার জায়গা হয়েছে অচিরেই... বর্ধমানের একটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটার পরে সমস্ত লেখাপড়া জানা বিভিন্ন অফিস কাছারিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা বা ছাত্র সংগঠন করা মানুষদের উপর নেমে এল কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনীর রুদ্র রোষ। প্রায় সবাই ঘরছাড়া পাড়া-ছাড়া এবং চাকরি-ছাড়া।

এমনই একজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতা গণশক্তি প্রেসে মুদ্রণ পরিদর্শক রূপে যোগ দিলেন তিনি সুবিমল সেন। আমি নন্দন পত্রিকার সর্বক্ষণের কর্মী। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই করতে হতো। মাসের মধ্যে ১৬/১৭ দিন থাকতে হতো গণশক্তি প্রেস পত্রিকা দপ্তরে। সেখানেই পরিচয় হল সাঁইবাড়ি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এই সুবিমল সেন-এর সঙ্গে। গৌরকান্তি ঝকঝকে চেহারার যুবক, এক মাথা কালো চুল পরিপাটি পোষাক নিয়েই তাঁর উপস্থিতি। সেখানেই প্রথমদিন দেখি কমিউনিস্টদের চিরায়ত ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত শান্তশিষ্ট গোছের একজনকে। সুবিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উনি একজন স্কুল শিক্ষক।

ইতিমধ্যে কিছু গোপন কাজ করার জন্য একটা প্রেস চালাচ্ছিলেন সুবিমলবাবু। প্রকাশ্যে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় মেনু কার্ড ছড়ানো। একদিন ধরা পড়লেন কলকাতা পুলিশের জালে। লর্ড সিনহা রোডে জেরার সময় টিকটিকিরা লাফিয়ে উঠলো—আরে এ যে সাঁইবাড়ির আসামী মৃদুল সেন।

জরুরি অবস্থা মিটে গেছে। ইন্দিরা গান্ধী সদলবলে পরাজিত। মৃদুলবাবুরা আবার সসম্মানে যোগ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমিও যোগ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ দপ্তরের কাজে যুক্ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন বললাম, আপনাকে তো স্কুল শিক্ষক বলে জানতাম। উনি হেসে জানালেন—স্কুল থেকেই তো এখানে এসেছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য হলাম আমরা সবাই। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মীবন্ধুরা এই নামেই ইউনিয়নটি চালাচ্ছিলেন। প্রতিদিনই টিফিনে মিছিল

মিটিং চলছে নতুন পে-স্কেলের দাবিতে। মিছিলে বক্তব্য রাখছেন মৃদুলবাবু, অশোকবাবু, পরে দিলীপ দুবে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমরা সবাই ভাই তাই শান্তিকে কাজ করতে চাই। অশোকদা গলা কাঁপিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝেই বলতেন—তা হলে একটা গল্প বলি শোনো।

এভাবেই চলছিল। বর্ধমানের পুরানো 'নতুন পত্রিকা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'নতুন চিঠি' নামে অশোকদা একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলেছেন। হবিবুল্লাহ আনোয়ার সহ-সম্পাদক, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ও প্রকাশক। অফিস নেই। সাধনা প্রেসে পত্রিকা ছাপা হয় আনোয়ারদার বাড়িতে ভাঁজ হয়ে পত্রিকা বিলির ব্যবস্থা।

এক সময় ২০ নম্বর জে বি মিত্র রোডে ভাঙাচোরা বাড়ির দোতলার একটি ঘর এবং বারান্দা পাওয়া গেল। শুরু হল ২০ নম্বরের জীবন। নিরুপম সেন থেকে শুরু করে জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ বাবু সবাই ওখানে জমায়েত হতেন। রামকৃষ্ণবাবু সম্পাদকীয় লিখতেন। কখনো একদিনও দেরি হয়নি সম্পাদকীয় দিতে।

অশোকদার মাথায় এল একটা ছাপাখানার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? প্রথমে এক পাতার টাইপ কেনা হল সরস্বতী প্রেস থেকে। অবশ্য একাজটা আমিই করেছিলাম। কারণ ওখানে আমার জানাশোনা ছিল। অশোকদার স্বপ্ন ছিল পত্রিকা বড় বড় টাইপে ছাপা হবে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত মানুষ যাতে বানান করেও পত্রিকা পড়তে পারেন। টাইপ কেনার জন্য নিজের মাইনের বদলে ঋণ নিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একপাতা থেকে আস্তে আস্তে দুপাতা...। এক সময় একটা ছাপার মেশিন কেনার কথা হল। খুঁজেপেতে পেলাম একটি স্বল্প ব্যবহৃত ট্রেড্‌ল মেশিন। সেটিও আনা হল কলকাতা থেকে। এসবই অশোকদার আন্তরিক চেষ্টার প্রতিফলন। শহরে বা শহরের বাইরে কোন বিশেষ ঘটনা থাকলে অশোকদার নির্দেশে বেশি করে ছাপতে হতো। তাতে অবশ্য মাঝে মধ্যে পত্রিকা সব বিক্রি হত না। স্বপ্ন আর বাস্তবে তো ফারাক হয়েই থাকে। ভালো জিনিস, সত্য কথা মানুষ সহজে মেনে নেয় না। দুধ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে হয় কিন্তু সরাবখানার লাইন এই লকডাউনেও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বিকোচ্ছে অনেকগুণ বেশি দামে।

অশোকদা ছিলেন সমবায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান। শ্রীধরপুর শতাধিক বছরের প্রাচীন সমবায়। জন্মসূত্রেই সমবায়ের মানসিকতা, পরবর্তীতে একাগ্র সৈনিক। বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওখান থেকেই বৃহত্তর পরিধিতে চলে যান কলকাতা। দুটি বৃহৎ অর্থকরী সংস্থান সঙ্গে চেয়ারম্যান হিসাবে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। সেই চিরাচরিত পোষাক এবং সাদামাটা যাপিত জীবন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এই বৎসরগুলিতেও অশোকদার পত্রিকার সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছিল না। তবে সব সময়ই চেষ্টা করতেন পত্রিকার উন্নতির জন্য।

সমবায় আন্দোলনের একটি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝেই থমকে যাচ্ছিলেন—কাজ এগোচ্ছে না। আমি পরামর্শ দিলাম একজন পেশাদার কম্পিউটার

অপারেটর নিন, কাজ এগোবে। এবং সেভাবেই 'সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস' বইটি প্রকাশিত হল। এটিকে ইংরাজি অনুবাদ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজে বেশিদূর এগোতে পারেননি। অনুবাদ হলে এটি একটি বিশ্বজনীন পরিচিতি পেত।

একটা সময় পত্রিকায় 'ইহা কি সত্য'? শিরোনামে কিছু বিষয় ছাপা হতো। আসানসোলের কোনো এক কংগ্রেস নেতার চিঠি 'প্রিয় পুলিশ...' ছাপার পর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হয়। সহ সম্পাদক আনোয়ারদা সাইকেলে করে স্টেশন যাচ্ছেন ভোরবেলা। পথে সাইকেল টাকা-পয়সা সব ছিনতাই হয়ে যায়। এক সময় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা নিয়ে বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় স্টল করে পত্রিকা বিক্রি করা হতো। শংকরদা (সরকার) থাকতেন, অশোকদার মেয়ে তোতা থাকতো এবং আরো কয়েকজন পত্রিকা বিক্রি করতেন একটা পরিবারের মানসিকতা নিয়ে। আহা, তোতা চলে গেল অকালে। ভালো অভিনয় করতো, ভালো আবৃত্তিও। একটা সময়ে বর্ধমানের প্রগতিশীল বেশ কয়েকজন মিলে তৈরি করেছিলেন একটি নাট্যদল—'অন্বেষা'। অশোকদা, মৃদুল সেন, গৌরী ব্যানার্জী, স্বপ্না সেন, অমল ব্যানার্জী প্রমুখ অভিনয় করতেন। তারই সঙ্গে ভালবেসে তোতার ভালো নাম রেখেছিলেন অন্বেষা। সে এক দুঃখমেদুর স্মৃতি।

কোলকাতার পাট চুকিয়ে একটা সময় বর্ধমানে ফিরে এলাম। প্রতিদিনই নতুন চিঠি দপ্তরে আসতেন। ও হ্যাঁ, দপ্তর কিন্তু উঠে এসেছে ২০ নম্বর জে বি মিত্র রোড থেকে আরতি সিনেমা লেনের বিশ্বনাথ বণিকের বাড়ির নিচতলার মার্কেটের একটা ঘরে। অশোকদার ব্লাড সুগার প্রচুর। নিয়মিত সূচ ফোটানোর একটা ব্যাপার ছিল। সারাদিন এবং রাত্রে বেশ কয়েকবার সুগার টেষ্ট করতেন নিজে নিজেই। এ অবস্থায়ও প্রায় দিনই একটু সুস্থ থাকলে নতুন চিঠি দপ্তরে আসতেন। কর্মীদের নতুন নতুন দিশা দিতে চেষ্টিত হতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও কোলকাতা বা অন্য কোথাও মিটিংগুলিতে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। বছরদুই আগেও নতুন চিঠি পরিবারের সঙ্গে বিহারিনাথ পাহাড়ে চলে গেলেন। অদম্য উৎসাহ। প্রতি বছরই নিয়মিত উত্তরবঙ্গে চা বাগানের অতিথিশালায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতেন। একঘেয়েমি কাটাতে এই স্বল্প ভ্রমণের জুড়ি নেই।

লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো সুন্দর একটা সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন দেখতেন তিনিও। পৃথিবীটা ক্রমশ দানবের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে—এ ক্ষোভ লক্ষ মানুষের ক্ষোভ—এক্ষোভে আমরা প্রত্যেকেই সামিল।

অশোকদা দীর্ঘকাল আমাদের স্মৃতিতে অমলিন থাকুন।

লেখক : *'নতুন চিঠি' পরিবারের প্রবীণতম সদস্য, কবি ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি।*

সেই আহ্বান ভোলা যাবে না

শিবানন্দ পাল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশক, প্রতিষ্ঠাতা উজ্জ্বল নক্ষত্র। যিনি একক উদ্যোগে এই পত্রিকা প্রকাশ করতে এগিয়েছিলেন।

পত্রিকা দপ্তরে তাঁর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার খুবই সামান্য, তবু স্মৃতির মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ। শুনেছি হাত ধরে নিয়ে এসেছেন, কাজ শিখিয়েছেন জহুর আলম, কিশোর মাকর এঁদের। তবে পরিচয় অনেকদিনের। সাল মনে নেই। বর্ধমান পৌর বিদ্যায়তনে আশির দশকের কোনো বছরে উৎসব হয়েছিল। সেই যুব উৎসবের স্মরণিকা তৈরির দায়িত্বে ছিলেন অশোকদা। তিনি আমাকে সহযোগী হিসেবে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। দুজনে রাত জেগে কাজ করেছিলাম, তাড়াতাড়ি স্মরণিকা প্রকাশ করার চেষ্টায়। ডিটিপি হচ্ছিল, সঙ্গে প্রুফ দেখা, আবার সংশোধন, দ্বিতীয় প্রুফ ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ শেষ হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়েই স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছিলাম কতটা জেদ, একাগ্রতা থাকলে মানুষ এইভাবে কাজ করতে পারেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ ফেলে রাখা যাবে না। আর প্রতিটি স্তর বুঝে নিতে হবে যতক্ষণ না নিজের মনের মতো পরিপূর্ণতা কাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে। নিজের সন্তুষ্টি চাই, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তুষ্টি না আসা মানেই সঠিক মানে না পৌঁছানো।

অশোকদা কলকাতায় খুব ভারি ভারি পদে কাজ করেছেন। কিন্তু নতুন চিঠি দপ্তরে যখন এসেছেন বা 'জাগরী'তে দেখেছি, তিনি সহজ সরল অনাড়ম্বর অশোকদা। এই মানুষই যখন কলকাতার কাচের ঘরে বসে কাজ করেছেন দেখেছি তাঁর চেয়ারম্যান সত্তা।

তিনি একবার সালানপুর যাবেন তাঁর কাজে, রানিগঞ্জে আমার কর্মস্থল তিনি জানতেন। খবর দিলেন 'শিবানন্দ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তোমাকে পাঞ্জাবি মোড়ে নামিয়ে দেব! আবার ফেরত আসার সময় আমার সঙ্গে চলে আসবে!' ঘন্টাখানেক অশোকদার সান্নিধ্য পাওয়ার লোভে রাজি হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে। নইলে পাঞ্জাবি মোড় থেকে আমায় কর্মস্থলে যেতে আবার বাসে চাপার ঝামেলা আছে। কারণ ট্রেনপথে মাহুলি ছিল, আর কর্মস্থল ছিল স্টেশনের নিকটবর্তী দূরত্বে। সেবার সমবায় সম্বন্ধে

অনেক গুরুগম্ভীর বিষয় তাঁর কাছে শোনার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতাও জেনেছিলাম। জেনেছিলাম মহম্মদ ইউনুস সাহেবের মাইক্রো ফিনান্সের গল্প, বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় থেকে কীভাবে স্বনির্ভরতা গড়ে উঠতে পারে।

দুর্গাপুর পার হওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় গাড়িটাকে সাইড করতে বললেন অশোকদা। সেখানে কোনো চায়ের দোকান বা খাবার স্টল, হোটেল কিছুই ছিল না। গাড়ি বাঁদিকে রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়াতেই দেখলাম অশোকদা স্কুল-ছাত্রদের টিফিনবক্সের মতো একটা ছোট্ট বাক্স তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে বের করলেন। ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন ইঞ্জেকশন ছিল ওতে। ইঞ্জেকশন রেডি করে আমাকে একটু ধরতে বললেন, তারপর পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পুটুস করে নিজের শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করলেন। এরকম দৃশ্য দেখার মতো অভিজ্ঞতা আমার খুব একটা ছিল না। আটাত্তরের বন্যার সময় ত্রাণকাজে জরুরি অবস্থায় গোটা চারেক ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেইজন্য জিজ্ঞেস করলাম—ভয় লাগে না? হেসে বললেন, ভয়ের কী আছে! এই তো এতটুকু নিডল!

ভালো করে দেখলাম তখন সত্যিই সাধারণ ইঞ্জেকশনের চেয়ে এই ইঞ্জেকশনের সুঁচ খুবই ছোটো।

অশোকদা সমবায়ের ওপর বই লিখলেন। সে বই প্রকাশ হবে কলকাতা বইমেলায়। একদিন আমরা গেলাম কোলকাতায় বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স গিল্ডের অফিসে। সম্পাদক ত্রিদিব চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা হলো। দে'জ পাবলিশিং-এর বাড়িতে গিয়ে সুধাংশু দে'র সাথে কথা বলা হল। কলকাতা বইমেলায় নির্দিষ্ট দিনে অশোকদার বই প্রকাশিত হয়। খুব অল্প সময়েই সব বই বিক্রি হয়ে যায়। বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের বিষয়ে অশোকদা উৎসাহিত হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন।

এরপর অশোকদা একদিন তাঁর সব দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অবসর নিয়ে পত্রিকা দপ্তরে এসে বললেন, এবার থেকে পত্রিকায় সময় দেবেন। নিয়ম করে সন্ধ্যায় সেরকম আসতেন। কোন সপ্তাহে কী বিষয়, দায়িত্ব বন্টন, লেখার জন্য তাগিদ দিয়ে ফোন করতে শুরু করলেন। আমাদের যান্ত্রিকতার মধ্যে নতুন করে একটা উন্মাদনা তৈরি হল। পত্রিকা প্রকাশের দিন মাঝে মাঝে সাধনা প্রেসেও চলে আসতেন। এক একবার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এসেছেন, সেদিন সাধনা প্রেসে যেন চাঁদের হাট বসে যেত।

কিন্তু অশোকদার শরীর পারছিল না তাঁর মনের জোরের সঙ্গে। মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সোডিয়াম পটাশিয়াম সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই নার্সিং হোমে ভর্তি হতে হচ্ছিল। লকডাউন পর্বে সেই যতিচিহ্নের দিনটি চলে এলো।

লকডাউন পর্বের প্রথম অধ্যায়েই অশোকদা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। নতুন চিঠি পত্রিকার প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ মার্চ, ২০২০ প্রয়াত

হলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত হল নতুন চিঠি পবিবার। আমরা অভিভাবকহীন হলাম। প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর মরণোত্তর দেহদানের সময় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে উ'স্থিত ছিলেন আজীবন সহযোদ্ধা ও সহধর্মিনী গৌরী ব্যানার্জী। মানবদরদী অশোকদা নিজের দেহটিও দিয়ে গেলেন মানবকল্যাণে। করোনাপর্বজনিত সমস্যার জন্য তাঁর শেষযাত্রার সময় এক মুঠো ফুল পায়ে রেখে মনে মনে বলতে পারলাম না আপাকে ভুলতে পারবো না অশোকদা, আপনার মতো মহৎদের ভোলা যায় না!

কিছুদিন আগেই আমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারির প্রথম হবে সময়টা। তার কিছুদিন আগেই তিনি নার্সিংহোম ঘুরে এসেছেন। অনেকটা চাঙ্গা দেখাচ্ছিল অশোকদাকে। আমাদের জন্য গরম সিঙ্গাড়া আর সন্দেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। চা সহযোগে গরম সিঙ্গাড়া খেয়ে সেদিন চলে আসার সময় একটা কথা বলেছিলাম অশোকদাকে। সেই কথা শুধু কথা হয়ে রয়ে গেল স্মৃতির পাতায়। অশোকদার হাসি হাসি মুখ— আবার এসো! সেই আহ্বান ভোলা যাবে না।

লেখক : *বিশিষ্ট লেখক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

অশোকদাকে যেমন দেখেছি

দিনেশ ঝা

আমাদের অশোকদা অর্থাৎ অশোক ব্যানার্জীকে নিয়ে লিখতে বসে আমি আমার মায়ের কথা দিয়েই শুরু করছি। ২০০৯ সালের শুরুতেই আমার মা হাত ভেঙে বর্ধমানে আমার বাসায় আছেন। অশোকদা কোথাও খবর পেয়েছেন, সকাল বেলায় রিক্সা করে আমার মা-কে দেখতে চলে এসেছেন। আমি বাড়িতে নেই। বাইরে কোনো কাজে বেরিয়েছি। বাড়ি ফিরতে মা বললেন, 'বউআ, তোহর মালিক আয়ল ছলথিন-র, বড্ড নিকলোক ছথিন। হমরো প্যার ছু-কর প্রণাম কলথিন-র বড্ড নিকলোক ছথিন। ইতনা বড়ে আদমি কোন ঘমন্ড নই-ছই রে।' কথাটি আমাদের বাজ্জিকা ভাষায়। যার অর্থ হল—বাবু তোর মালিক তো খুব ভালো লোক, বড় মানুষ। আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। এত বড় মানুষ কোনো অহংকার নেই। হ্যাঁ, সত্যি অশোকদার মতো এতো নিরহংকারী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

১৯৮৭ সালের শেষের দিকে আমি 'নতুন চিঠি'তে কাজে যোগ দিই। আমার কিছুদিন পূর্বেই কাজে যোগ দিয়েছিল দুখদেব মণ্ডল। পুজোর আগে এসেছিল। পুজোর পরে আমি। দুখোরও আমার মতোই কম বয়স। প্রেসে ছিল বিনয়দা, বৈদ্যনাথ দা, লক্ষ্মী, পরেশদা। এঁরা সকলেই প্রেসের কর্মী ছিলেন। পত্রিকার কাজে যুক্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অরুণ মজুমদার, জহুর আলম, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ম্যানেজার ছিলেন প্রতাপ প্রামাণিক। এনারাই পত্রিকা পরিচালনা করতেন। চা-গ্রাম থেকে দৈনিক আসতো মোতি মামা। অশোকদা তখন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ভাইস-চেয়ারম্যান। সন্ধের পর আসতেন। কোনোদিন একেবারে সকালে চলে আসতেন। একসঙ্গে টিফিন খাওয়া নতুন চিঠির এক প্রচলিত রেওয়াজ ছিল। অশোকদাও একসঙ্গে টিফিন করতেন। দুখদেব তো অশোকদাকে জোর করেই বেগুনি খাওয়াতে চাইতো, কিন্তু উনি খেতেন না।

শীতকাল। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। 'তথ্য কথা বলে' প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। আমাদের প্রেসের বাইন্ডার গণেশদা অর্থাৎ গণেশ ঘোষের বাড়ি রথতলা হয়ে পত্রিকা দপ্তরে এলেন অশোকদা। সবাই মিলে আমরা টিফিন করছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে ঢুকলেন। দুখদেব বলল, "কী ব্যাপার, এতো খুশি-খুশি লাগছে। বেগুনি খাবেন?" খোস মেজাজে ছিলেন অশোকদা। উত্তর দিলেন, "আমাকে কি তুই

বেগনি খাওয়াবি রে, জানিস আমি অশোক রাজা। আমাকে লুচি এসব খাওয়াবি। জানিস আমার ছোটবেলায় আমার বন্ধুরা কী লিখে দিয়েছিল, আমার বাড়ির দোরগোড়ায়? এটা অশোক রাজার বাড়ি। তুই আমাকে বেগুনি খাওয়াবি? সেদিন সন্ধ্যায় জোর করে বেগুনি খাওয়ালি, ভালো-ভালো বলে খাইয়ে দিলি। পেটের গোলমাল হয়ে গেল।" লোভনীয় কিন্তু খাওয়া যাবে না। অদ্ভুত সংযম যাপন করতেন তিনি।

প্রতাপদা আসেননি, জহুরদার জ্বর। দেবুদা কালনা থেকে সোজা কাটোয়া চলে গেছেন। স্যার অর্থাৎ জ্যোতির্ময়বাবু কোনো কর্মসূচিতে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে। শনিবার আর কাগজ হয়নি। রবিবার সকালে অশোকদা হাজির। ধরেছেন আমাকে—"তুই কেন ডামি করে দিসনি, কাগজ বেরোতে যে দেরি হল। সকালেই কালিশঙ্কর ফোন করেছিল।" ওরা আমতা আমতা করছে। নিজে ডামি করে দিলেন, মেকআপ হল। দুপুরের মধ্যে কাগজ ছাপা হল। যাবার আগে অশোকদা বলে গেলেন—"শনিবারের কাগজ শনিবারের দুপুরের মধ্যেই চাই।" এমনই সময়ানুবর্তিতা ছিল অশোকদার। শনিবারেই কাগজ গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে যেতে হবে।

সাংবাদিকতার অ-আ-ক-খ শিখেছিলাম জহুরদার কাছে। শুরুর দিকে কপি রি-রাইট করতে হতো। স্বাধীনভাবে খবর করেছি অনেক পরে। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় অশোকদা এলেন। বললেন, "কাল সকালে কালনা যাবো, তুই ঠিক ৮টার মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে চলে আসবি আমার বাড়িতে। তোকে যেতে হবে।" ৮টা বলে একটু ইতস্তত করলাম। তখন আমাদের ছিল জেনিথ ক্যামেরা,

মাঝে মধ্যে সাটার লক হয়ে যেত বলে শুনেছি। জেনিথ নিয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না। পরের দিন পৌনে ৮টায় অশোকদার বাড়ি সুভাষপল্লী। অশোকদা প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। বৌদিকে বললেন, "দিনেশ এসে গেছে, ওকে খেতে দাও, সময় হয়ে গেছে।" অশোকদা-র সেই সিদ্ধ-সিদ্ধ খাবার। আমি রুটি সব্জি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই আমার তোলা প্রথম ফটো প্রকাশিত হয়েছিল 'নতুন চিঠি'র প্রথম পাতায়। বড় ধামাস গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জলি পাল সাইকেলে নিজের পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম ঘুরছেন। হ্যাঁ, তাঁকে আমরা রাস্তাতেই পেয়েছিলাম। অশোকদা নিজেই প্রতিবেদন লিখেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষ প্রতিবেদক হিসাবে। অশোকদা নিজে ঘুরে-ঘুরে এই ধরনের রিপোর্টাজ বা ফিচার করতেন। কখনও নাম দিতেন না। কখনও সখনও লিখতেন 'বিক্রমাদিত্য রাজা' নামে। এরকম আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন তিনি।

এই সময়ই একদিন রাত ৯টায় অফিসে হাজির। 'তথ্য কথা বলে' ছাপা চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে। অশোকদা ছুটে বেড়াচ্ছেন। বললেন, "কী ছাপছিস?" 'তথ্য কথা বলে'-র শেষ ফর্মা ছাপা চলছে। দশটা-সাড়ে দশটা বেজে যাবে। ছাপাও তো কম নয়। এসেই প্রথম কথা হল, "এদের খাইয়েছিস? খাইয়ে দে, রুটি-তরকা যা খাবে খাইয়ে দে। পরেশ, সুখদেও শেষ করে যাবি। সকালে গণেশদা এসে নিয়ে যাবে।" দুখদেবকে অশোকদা সুখদেও বলতেন। ওই সময়ই তাঁর চোখের সমস্যা দেখা যায়, সেবার এন.আর.এস. হাসপাতালে অপারেশন হয়েছিল। এরকম মানুষ ছিলেন অশোকদা।

'নতুন চিঠি প্রেস'ও গড়ে উঠেছিল অশোকদার উদ্যোগে। তাঁর নামেই লোন নিয়ে মেসিন কেনা হয়েছিল। কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে সর্বদাই সচেতন থাকতেন। আমাকে বলতেন, "বাইরে থেকে কাজ ধরে নিয়ে আয়। কাজ হলে এরা কিছু টাকা পয়সা পাবে। কতই আর বেতন পায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো খুব মুশকিল। ভালো কাজ করতে হবে। নিখুঁত নির্ভুল ছাপতে হবে, যাতে নিজে থেকে কাজ আসে।" ছাপার কাজ আমাদের প্রেসে ভালোই হতো। অশোকদা বলতেন, "প্রেস চললে পত্রিকাও চলবে। প্রেসের চাকা ঘুরলেই লাভ হবে।" আমরা বড়-বড় ও সুন্দর কাজ করে সময়ের আগেই লোন পরিশোধ করেছিলাম। অশোকদা ভীষণ দূরদর্শী ছিলেন।

অশোকদা ভীষণভাবে কর্মীদের কথা ভাবতেন শুধু নয়, উপলব্ধিও করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ির হাঁড়ির খবর রাখতেন। ওনার বাড়ির কাজের লোকেরাও ওনার বাড়ির লোক হয়ে যেতো। বয়স্ক হলে যথোপযুক্ত সম্মানের সাথেই সম্বোধন করতেন। আমি নিজে অর্চনাদি, বা চাঁপাকে ভুলে যেতে পারবো না। এঁরা সকলেই অশোকদার পরিবারেরই সদস্য ছিল। তাঁদের বিয়েতেও অশোকদাকে গৃহকর্তা হিসেবে কাজ করতে দেখেছি। অর্চনাদিকে তো নিজের বোনের মতোই ভালোবাসতেন। প্রতি বছরই তাঁর কাছে ভাইফোঁটা নিতে চলে যেতেন হিজলনায়। গাড়ি না থাকলে ভ্যানে

গেছেন। অশোকদার বাড়িতে ছিল সকলেরই অবারিত দ্বার। এমনিতে ওনার নিজের আত্মীয়-কুটুম্ব তো কম ছিল না। গোটা শ্রীধরপুর গ্রামের মানুষের সব সময়ই তিনি আপনজন ছিলেন। যখনই ওনার বাড়িতে গেছি, কেউ না কেউ তাঁর বাড়িতে আছেন। সে হোক না কেন শ্রীধরপুর বা আমাদের এই বৃহত্তর পরিবারের লোক, যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গেই তিনি সখ্য, ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারতেন নিমেষে।

অশোকদার একটি বিশেষত্বের কথা না বলে থাকতে পারছি না। তবে সেটাও তাঁর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রতি গভীর ভালোবাসাই। অগাধ ভালোবাসা ছিল। কুৎসা নিন্দা নয়, পার্টির নামে কোনো সমালোচনাই তিনি বরদাস্ত করতেন না। প্রমাণ দাও, ব্যবস্থা নেবো—বলে একবারে ধরতেন। যেখানকার ঘটনা প্রসঙ্গ তৎক্ষণাৎ সেখানে ফোন করতেন, নেতৃত্বস্থানীয়দের কাছে খোঁজ নিতেন। সত্যিই কী ধাতুর মানুষ জানি না। পার্টি ও মতাদর্শের প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে অশোকদার কাছে ছিল তা শিক্ষণীয়।

ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে অনেক আঘাত নেমে এসেছে তাঁর। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। তবুও অশোক ব্যানার্জীকে দমানো যায়নি। মতাদর্শের প্রতি কী আস্থা—সর্বদাই তাঁকে মাথা উঁচু করে হাঁটতে দেখেছি।

অশোকদাকে নিয়ে অনেক-অনেক ছবি আমার স্মৃতিপটে ভিড় করছে। অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন। আমি কোনোভাবেই পুনরুক্তি করতে চাই না। তিনি ছিলেন বিশাল মাপের মানুষ। এই ধরনের মানুষেরা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অশোকদাকে স্মরণে রাখতে হবে। নিজের একমাত্র সন্তানকেও তিনি হারিয়েছিলেন। সন্তানস্নেহেই তিনি লালন-পালন করতেন তাঁর সৃষ্ট 'নতুন চিঠি'-কে। নতুন চিঠি-কে বাঁচিয়ে রাখার কঠিন কঠোর কাজটি আমরা যদি করে যেতে পারি, তাহলেই অশোকদা—অশোক ব্যানার্জী আমাদের মধ্যে ভাস্বর থাকবেন।

লেখক : *'নতুন চিঠি'র কর্মী।*

অপ্রকাশিত প্রকাশক

পার্থ চৌধুরী

মাটির মানুষ ছিলেন আমাদের অশোকদা। মাটির মানুষ ছিলেন বলেই তিন তিনটি সংস্থায় উচ্চপদে থেকেও পদের গরিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অশোকদার বর্ণময় জীবন। তার নানা দিক এর আগে নানা লেখায় আলোচিত হয়েছে। আমি বরং প্রকাশক এবং সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

একটা অনুযোগ আমি অশোকদাকে করেছিলাম। গণ-আন্দোলন, সমবায়, সংগঠন এইসব বিষয়ে সময় দিতে গিয়ে সাংবাদিক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা চাপা পড়ে গেছেন। আমাদের এই অনুযোগ অশোকদা মানতেন। অশোকদার সাংবাদিকতার ধারাটা ছিল মানুষের মুখের কথা তুলে আনা। আমরা খবর করে ফিরে মাঝেমাঝে অশোকদার খপ্পরে পড়েছি। কী হলো? আমরা বললাম— বিরাট সভা হলো। অমুক চমৎকার বললেন। এতো অল্পে দামোদর শেঠ বা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি হন না। 'তা বুঝলাম। তা ওখানে যারা এসেছিল তাদের সাথে কথা বলেছিস?—হুম'। কোনোক্রমে ম্যানেজ দেবার চেষ্টা করি—তা বলেছি বৈকি। এইবার অশোকদা তাঁর আস্তিন থেকে অমোঘ অস্ত্রটা বার করলেন—'টেপ করেছিস'? কই শোনা'—

কমলদার ভাষায় 'গা খাটার দলে' যেসব মানুষ তাদের কথা ও কাহিনি শোনার মতো কান ও হৃদয় ছিল অশোকদার। রামনারায়ণদা বলেছিলেন— 'মাটির মানুষের ভাষা বুঝতে গেলে তাদের কাছে যেতে হবে। এর কোনো শর্টকার্ট নেই।' অশোকদা চাইতেন তাঁর কাগজে মাটির মানুষের কথা উঠে আসুক। একাজে তাঁর সহযাত্রী আমাদের স্যার জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। কার্যত এঁদের চেষ্টাতেই 'নতুন চিঠি' একটা অন্য ঘরাণার সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছিল। আরো তিনজন মানুষের নাম করতে চাই। একজন নীরবে কাজ করে যাওয়া আমাদের আর এক স্যার রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অন্য দুজন অরুণ মজুমদার আর জহুর আলম। আমরা আসার আগে এঁরা যে পথ তৈরি করে রেখেছিলেন সেই পথেই আমরা হেঁটে গেছি। মাঠটা ক্রমশ বড় হয়েছে। সংকীর্ণ হয়নি।

অশোকদার সাথে আমার আলাপ এলাকায় সাংগঠনিক কাজের সূত্রে। অশোকদা মাঝেমাঝে এলাকায় সভা করতে আসতেন। অশোকদা এলেই সাজো-সাজো রব পড়ে যেতো। আমরা আড়ালে বলতাম 'অংক স্যার'। অশোকদার মুখোমুখি হয়ে

নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকের মতো আমিও নাকাল হতাম। রীতিমতো খুঁটিনাটি ছকে নিয়ে আলোচনায় বসতেন যে!

যাইহোক, এলাকায় কাজ করতে করতে আমার 'নতুন চিঠি'-তে যোগ দিতে বলেন স্যার। এলাকার প্রতি ভীষণ টান। অল্প বয়েস। আমি না থাকলে এলাকা অচল হয়ে যাবে এই ভাবনায় ডুবে থাকতাম। কোনো কিছুই যে কারও জন্য থেমে থাকে না বোঝার বয়স ছিল না।

সে সময় নতুন চিঠিতে রীতিমতো নক্ষত্রমণ্ডলী। পুরো ফর্মে জহুরদা, অরুণদা, রামকৃষ্ণবাবু। তরুণ তুর্কী ইমানুলদা, দিনেশদা; কিশোরদা। পরবর্তীতে বন্ধু হয়ে ওঠা ফজলুল। সেখানে আর একজন সাংবাদিকের কোনো প্রয়োজন ছিল না। 'ফাই ফরমাশ খাটার কাজে' নিযুক্ত হলাম সেখানে। মাঝে মাঝে লেখার সুযোগ শিকে ছিঁড়লে। দিনেশদাও তেমনই অশোকদার গাড়ি চালাবার জন্য এসেছিল। আমি যেটা বলতে চাই, স্যার এবং অশোকদা নতুন চিঠিকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে আমাদের মতো সাধারণ কর্মীরাও এখানকার নেতৃত্বে উঠে আসতে পেরেছিলো। তখন আমাদের এখানে প্রেস ছিল। লক্ষ্মীদা, বিনয়দা, বৈদ্যনাথদা বা পরেশদারা সদা ব্যস্ত। তবু ওদের কাছে আমার আশ্রয় ছিল। আরও তিনজন প্রতিদিন আসতেন। শঙ্কর ঘোষাল, শঙ্কর সরকার আর মলয় রায়। এঁদের নিয়ে জমজমাট সংসার। বিকেলবেলায় কাগজ পেতে মুড়ির আসর।

অশোকদার সঙ্গে আমরা যারা পরে এসেছি খুব বেশি কাজের সুযোগ পাইনি। কিন্তু নিজের ব্যস্ততার ফাঁকে ফুরসত পেলেই নতুন চিঠিতে চলে আসতেন অশোকদা। মূলত 'তথ্য কথা বলে' সংকলন করতে গিয়ে অশোকদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা

বাড়ে। গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে বার করার কাজ সেটা। একটা জিনিস দেখেছি, নিষ্ঠা কাকে বলে! হাতের কাজ না সেরে কিছুতেই উঠতেন না। সঙ্গের ছোট টিফিন ক্যারিয়ারে নিজের স্বল্প-আহার। তার মাঝে সহকর্মীর খাবার বন্দোবস্ত করা। ইনসুলিন নেওয়া।

'সেকেন্ড এডিটোরিয়াল', 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ার', 'স্পেশাল ফিচার' এসব নিয়ে গল্প জমে উঠতো কাজের ফাঁকে। কিন্তু মন বলতো এরপরই সেই প্রশ্নটা আসতে চলেছে— 'টেপ করেছিস?' এরপর নানা পর্যায়ে নতুন চিঠির আধুনিকীকরণ হয়। পত্রিকা অফসেটে হয়। সাধনা প্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রেস সংযুক্ত হয়। সেখানে অফসেট বসে। 'আজকের চিঠি', 'আরশিনগর' তৈরি হয় দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে। স্টুডিও-এ এডিট সেটআপ বসে। নতুন নতুন কর্মীর আগমনে গমগম করে ওঠে নতুন চিঠি পরিবার।

অশোকদা এই প্রতিটি পর্যায়ে সাহস যুগিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিয়ম মেনে চলা, একনিষ্ঠ নীরব মানুষ ছিলেন অশোকদা। কিন্তু স্যারের সাথে তাঁর বোঝাপড়াটা দেখার মতো। দু-জনেই দু-জনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দুজনে দুরকম। সেটাই হয়তো দুজনের বন্ডিং টিকে থাকার অন্যতম রসায়ন। একথা বললে অশোকদা মৃদু হাসতেন। স্যারও। যারা ভাবেন নতুন চিঠি একই মতের মানুষদের জমায়েতের জায়গা, তাঁরা পুরো ঠিক জানেন না। এখানে কোনো ধমক দিয়ে ধামা ধরানোর ব্যাপার ছিল না। মুক্তচিন্তার পরিসর। আড্ডা, আলোচনা, তর্ক। এমনকি মতান্তরও এখানে হয়ে থাকে। অশোকদা এইসব আড্ডা আলোচনা উপভোগ করতেন। মাঝে মাঝে সব কথা তাঁর মন মানতে চাইতো না। আমাদের মতো হাতে-গড়াদের সঙ্গে প্রবল তর্কে মাততেন। কিন্তু যদি বুঝতেন তাঁর কথা ঠিক ছিল না—দু-বছর বাদে হলেও অনুজদের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। মনে পড়ে আমি আর দিনেশদা বৃষ্টিতে ভিজে হাজির ডব্লু.বি.এফ.সি-তে। "অশোকদা এখুনি ২৫ হাজার টাকা দিন"—অবাক হলেও সেই বৃষ্টিতে আমাদের সঙ্গে চললেন নতুন চিঠির জন্য কম্পিউটার 'বুক' করতে।

রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবের স্মরণিকার দায়িত্বে ছিলেন অশোকদা। 'যৌবন' নিয়ে আমার একটা লেখা ছিল। বই ছেপে এনে নিজেই অবাক। সবার আগে আমার লেখা। এই সিদ্ধান্ত নিতে হিম্মত লাগে।

অশোকদা শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার পেয়েছেন। আমি কলকাতায় 'গণশক্তি'তে রাতে ছিলাম। সকালে সাক্ষাৎকার নিতে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে গিয়ে শুনি অশোকদা ডব্লু বি এফ সি-তে গেছেন। তখন সবে সিকিউরিটি ব্যাপারটা এসেছে। অশোকদার ঘরে ঢুকবো। দ্বাররক্ষী ভদ্রলোক খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, 'চেয়ারম্যান বিজি আছেন'। আমি বললাম—"আপনাদের চেয়ারম্যানই আমাদের চেয়ারম্যান (প্রকাশক)"। অশোকদা শুনে খুব হাসলেন। সেবারে পাওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা পার্টি ফাণ্ডেই দিয়ে দিলেন। তসরের পাঞ্জাবিটা আমাকেই দিয়ে দিলেন।

অশোকদা ভীষণ কাজের মানুষ ছিলেন। কাজের জন্য ছটফট করতেন। আমি আড্ডাবাজ। গল্প করতে ভালোবাসি। তবু তাঁর ব্যস্ততার মাঝে আমার 'অপ্রাসঙ্গিক' বকর বকর-এর জন্য একটু সময় বাঁচিয়ে রাখতেন। কাজে অশোকদাকে হারানো মুশকিল ছিল। এসেই 'দিনেশ কিংবা মাকর সাহেব—খাতাটা দে।' বলে লিস্ট নিয়ে বসতেন। নতুন চিঠির সাংবাদিক অথচ অশোকদার তাগাদার সম্মুখীন হননি এমন কেউ নেই বলেই মনে হয়।

একদিন সকালে বসে আছি। আগের রাতে বই ছেপে আনা হয়েছে রাতে শংকরদা রেঁধেছিলেন। আমি দিনেশদা আরও রাতে জেগেছি। সকালে আমি একা। চারপাশ বিশ্রান্ত। এদিক ওদিক ধুলো। কাগজের টুকরো। ক্লান্তিতে পরিষ্কার করার কথা মাথায় আসছে না। অশোকদা এলেন। চারদিক দেখলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে ঝাঁটাটা তুলে নিলেন। তারপর.....

একবার দুর্গাপুরে একটা রাজ্যস্তরের কনফারেন্স। বিধ্বস্ত হয়ে বর্ধমানে। স্যার বলেছেন, কাগজটা ছাড়তে হবে। প্রুফ দেখে প্রিন্ট অর্ডার দিয়ে বেরোতে যাবো—হঠাৎ অশোকদা।

পকেট থেকে কিছু কাগজ আর টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'যা সত্যযুগ থেকে বইটা নিয়ে আয়।'

প্রচণ্ড রাগ হলো। বলেই দিলাম—'আমি পারবো না।'

অশোকদা একটু থামলেন। তারপর সটান আমার দিকে ঘুরে বললেন—'ওহ। পারবি না। তা বেশ। টাকাটা দে। আমিই যাচ্ছি।'

আচ্ছা আপনারাই বলুন এরপর কোনো 'ক্যাডার' কী করতে পারে? 'লিডার' হলে এমনই হতে হয়।

প্রবীণ সাংবাদিক তারক রায় আর সুখেন্দুবিকাশ নন্দীর সাথে কথা হচ্ছিল। ওঁরা জানিয়েছেন সাংবাদিক হিসেবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার পক্ষপাতী ছিলেন অশোকদা। বিজ্ঞাপন কমিটিতে থাকাকালীন ছোট কাগজের স্বার্থ দেখার চেষ্টা করেছেন। প্রেস ক্লাবের সঙ্গেও নিবিড়ভাবেই যুক্ত ছিলেন।

সাংবাদিকতার একটা ধারা সাধারণ মানুষকে তুলে ধরে। ফসলের ছবি তুলে ধরে শুধু নয়, যে ফসল যে ফলিয়েছে আর যে হাত সৃজনে আর নির্মাণে ফার্নেসের কাজ করে তাদের কথা বলতে চায় যে সাংবাদিকতা—নতুন চিঠি তারই পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে। সেই পথে অগ্রচারণ করে গেছেন অশোকদা, স্যার, রামকৃষ্ণবাবুরা।

এই পর্যন্ত লিখে মনে হল তাঁর পার্টির প্রতি ভালোবাসার কথা না বললে অসম্পূর্ণতা থাকবে। পার্টিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন অশোকদা। কদিন আগে বলছিলেন "সবাই না ভাবলে পার্টিটা চলবে কী করে?" তাই তো বৌদিকে বলে যেতে পেরেছেন, "আমি না থাকলেও তোমার পার্টি তো রইলো।" শেষ সঞ্চয়টুকু আর মৃত্যুর আগে এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন পার্টিকেই। নতুন চিঠিতে আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা এসেছেন। নিরুপম সেন, মদন ঘোষ,

অরিন্দম কোঙার, কালাচাঁদ নাথ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, হরিশ কর, শ্যাম বসু, সুরেন মণ্ডল। আমরা ভালো কাজ করলে উৎসাহ দিতেন গৌরদা—মালেকদা। এত মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল যে পরিবার, আজ সে নিজেই সঙ্কটে। পরিজনেরাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে অশোকদা ফিরে এসেছিলেন নতুন চিঠিতেই। তাঁর হাতে তৈরি সংগঠনে একজন কর্মী হিসাবে শেষ দিন অবধি কাজ করে গেছেন। কাজ না করতে পেরে ছটফট করেছেন।

সার্থকনামা ছিলেন অশোকদা। ব্যক্তিজীবনের শোক দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছে কিন্তু কক্ষচ্যুত করতে পারেনি। তোতাদি চলে যাবার পর আমরা অশোকদার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। কমলদার মৃত্যুর পর আমরা একটা স্টোরি করি। তাতে উল্লেখ ছিল—কমলদার নিজের বাড়ি ছিল না। সহকর্মীর বাড়িতেই থাকতেন।

খবরটা দেখে অশোকদা আমায় ফোন করেন। বলেন—ঠিকই আছে। তবে তুই একটু ভুল লিখেছিস। কমলদা নিজের বাড়িতেই থাকতো। আমার মা মারা যাবার আগে ওই অংশটা কমলদাকেই দিয়ে গিয়েছিল.....

এতো নির্যাতন, এত শরীরের কষ্ট, এত আঘাত, এত উত্থান-পতন, তবু হার মানেননি কোনো দিনও।

সব কিছু ছেড়ে এলেন যেদিন...

সেদিন আমি বসেছিলাম বারান্দার পাশে বেঞ্চিতে। রবিবার। লোকজন নেই। অশোকদা এসে পাশে বসলেন—

"আমি তো এখানেই ফিরে এলাম... জানিস তো।"

"হুম। আবার কোথায় যাবেন? আপনি আমাদের লোক। এখানেই তো ফিরবেন..."

"কিন্তু.... তোরা কি আমায় গ্রহণ করতে পারবি? আমি কি পারবো?...."

আমি উঠে দাঁড়ালাম। "বলেন কি অশোকদা! আপনাকে আমরা মাথায় করে রাখবো।"....

তাই রেখেছি আমরা। রাখবোও।।।

শেষদিন ওনার বাড়ি। আমাকে বললেন "আবার লিখতে পারিস না? অমন লেখা! পড়লে বুকের ভেতরটা....

—চেষ্টা করবো। কথা দিলাম।

লেখক : *বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

প্রেষণাই ছিল অশোকবাবুর প্রাণশক্তি

শ্যামসুন্দর বেরা

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব বা সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিবর্গের কর্মস্পৃহার ওপর। কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা (ইংরেজিতে 'মোটিভেশন') হল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার ইচ্ছা অথবা কাজে মনোনিবেশ না করা বা কাজ থেকে মন সরিয়ে নেওয়া। বাস্তবে আন্তরিকভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ এবং অনন্যোপায় হয়ে কিংবা একরকম বাধ্য হয়ে কাজের ভান করে লেগে আছেন—দুরকম মানুষই চোখে পড়ে। কর্মস্পৃহা বিষয়টি মানুষের মনের একেবারে ভেতরকার বিষয়। কাজের প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক মানসিকতা নির্ভর করে মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পারিবারিক শিক্ষা এবং মানবিক চেতনার ওপর। জোর করে বা আইন করে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা তৈরি করা যায় না।

লেখার শুরুতে জনপ্রশাসন বিষয়ক একটি প্রাথমিক তত্ত্বের উত্থাপন না করলে আমার অনুভবে কেমন ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তা বলা যাবে না। প্রথম দর্শনে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হয়তো করা যায় কিন্তু অনুভবের জায়গা তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে, লাগে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ। পরিচিতির কেন, বলা

যায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বৃত্তে তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি পঁচিশ বছর। প্রবন্ধ বা নিবন্ধে 'আমি' বা 'আমার' শব্দগুলির প্রয়োগ অনুচিত। এই লেখা সম্পূর্ণ রূপে স্মৃতিচারণ। স্বাভাবিক কারণে শব্দগুলি এসেছে।

বর্ধমানে আমার প্রথম আসা ১৯৯৫ সালে। উদ্দেশ্য 'নতুন চিঠি' পত্রিকার মুদ্রণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণের অঙ্গ হিসেবে কম্পিউটারে বাংলা সফ্‌টওয়্যার লোড করা। একই সঙ্গে সাপ্তাহিক ট্যাবলয়েড পত্রিকার টেমপ্লেট তৈরি করা এবং কীভাবে কম্পোজ করা হয়,তারপর অফসেট মুদ্রণের জন্য ট্রেসিং-এ কীভাবে প্রিন্ট নিতে হবে তা দেখানো। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি থেকে অফসেটে ছাপার জন্য ট্রেসিং করা পর্যন্ত পর্বগুলি বাস্তবে উপস্থাপন করা। কলকাতার দৈনিক খবরের কাগজে সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এবং সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ অভীক গোস্বামীর সঙ্গে পূর্ব পরিচিতির সূত্রেই এসেছিলাম বর্ধমানে।

'নতুন চিঠি'-র ৬২ বি সি রোডের ঠিকানায় তখনও কম্পিউটার আসেনি। কম্পিউটার ছিল সিপিআই(এম) জেলা দপ্তর প্রভাত কুণ্ডু ভবনে। সেদিন সফ্‌টওয়্যার লোড করা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে দু-জন প্রাজ্ঞ মানুষ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। খানিক খানিক ছিলেন দিনেশ ঝা, পার্থ চৌধুরী। এক বেলায় একটা মানুষ কীভাবে চার পাতার একটা ট্যাবলয়েড কম্পোজ করবে তা দেখতে উপস্থিত ছিলেন তখনো লেটার প্রেসে চলা সাধনা প্রেসের কম্পোজিটররাও।

লেটারপ্রেস, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ, পিটিএস (ফটোটাইপ সেটিং)-এর পরে খবরের কাগজে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি হিসেবে আসে ডিটিপি এবং অফসেট। কলকাতায় সংবাদপত্র দপ্তর, ছাপাখানা ইত্যাদিতে ব্যাপক ভাবে ডিটিপি-অফসেট চালু হলেও সে-সময় এই প্রযুক্তিতে ছাপার কাজ বর্ধমানে চালু হয়নি। কিছু পত্রপত্রিকা বাইরে কম্পোজ করে অফসেট প্রিন্ট করে আনত। সাপ্তাহিক কাগজ হিসেবে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব সম্ভবত 'নতুন চিঠি'-রই। বলা যায়, খবরের কাগজে ডিটিপি ব্যবহারে আমরা ছিলাম প্রথম প্রজন্মের। এই নিয়ে আমাদের একটা শ্লাঘা ছিল যে আমরা একই সঙ্গে কম্পিউটার এবং আধুনিক মুদ্রণের খুঁটিনাটি জানি।

বর্ধমানে আসার দিন প্রথম পর্বে ছিল বাংলা সফ্‌টওয়্যার লোড করার বিষয়টি। সেই কাজ করতে গিয়ে আত্মশ্লাঘা ধাক্কা খেয়েছিল যাট ছুঁইছুঁই অশোকবাবুকে দেখে। এই বয়সী একজন মানুষ বর্ধমানের সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে ১৯৯৫ সালে কম্পিউটার বিষয়ে এত এগিয়ে! এত আধুনিক! মনোটাইপের বাংলা সফটওয়্যারের জন্য কম্পিউটারের কী কনফিগারেশন লাগে, উইনডোজ-এর কত ভার্সন লাগে, হার্ড ডিস্কে কত জায়গা নেবে, কমপক্ষে কত মেমোরি থাকতে হয় ইত্যাদি অশোকবাবুর নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ওনাকে দেখা এবং ওনার সম্পর্কে অবাক হওয়ার সেই শুরু। জ্যোতির্ময়বাবু অবশ্য কম্পিউটারের কারিগরি

বিষয়ে তত কিছু জানতে চাননি। তিনি টাইপোগ্রাফি, গ্রাফিক্স, লেখচিত্র, পেজ-ডিজ়াইন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। পেজমেকার, কোরেল ড্র, ফটোসপ ইত্যাদির ব্যবহারে টেক্সট এবং গ্রাফিক্স-এর মিশেলে পত্রিকার যে রূপ বদল হবে এবং মনের মতো করে উপস্থাপন করা যাবে সে বিষয়টিতে নিশ্চিত হয়েছিলেন দুজনেই।

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পরে সে-সময় আমার কর্মস্থল ছিল 'যুগান্তর'-'অমৃতবাজার পত্রিকা'। চরম ডামাডোলের সময়। মালিক পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে, শ্রমিক সংগঠন চালু রাখার চেষ্টা করছে। বেতন দেবে কে তার নিশ্চয়তা ছিল না। 'যুগান্তর'-এর এমন অবস্থা জেনেই বোধহয় 'নতুন চিঠি'র পরিচালকরা ডিটিপি করার ব্যাপারে আমার কথা ভেবেছিলেন। খোঁজ নিয়ে একদিন 'যুগান্তর'-এর নোনাপুকুর ট্রামডিপোর অফিসে হাজির হয়েছিলেন দিনেশ ঝা। সেখানেই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানান। শুরু হয় আমার বর্ধমান-যোগ। প্রতি শনিবার সকালে এসে সাপ্তাহিকের কাজ সেরে সন্ধ্যায় ফিরে যেতাম শেওড়াফুলি। সাপ্তাহিক সংখ্যা, নানা বিশেষ সংখ্যা, প্রায় সাড়ে চারশো পাতার শারদ সংখ্যা—নতুন চিঠি-র তখন অনেক কাজ। সুচারু সেইসব প্রকাশনার কাজে আস্থাভাজন হয়েছিলাম কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষ বলতে জ্যোতির্ময়বাবু সম্পাদক আর অশোকবাবু ছিলেন 'নতুন চিঠি'র প্রকাশক। স্বত্বাধিকারী হিসেবে তাঁর নাম থাকলেও তথাকথিত 'মালিক' তিনি ছিলেন না। আসলে 'নতুন চিঠি' শুধু একটি পত্রিকা নয়, সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলার একটি শাখা সংগঠন। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নতুন চিঠি পত্রিকার প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

আমার প্রথম দেখার সময় অশোকবাবু ছিলেন একজন ব্যস্ততম মানুষ। ছিলেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের সভাপতি। এছাড়াও যুক্ত ছিলেন নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। থাকতেন কলকাতায়। প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। মাঝেমাঝে দেখা হত শনিবারে।

'যুগান্তর'-'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র ডামাডোল দেখে, প্রাইভেট সংস্থায় কাজের ধরন, বেতন, নিরাপত্তাহীনতা অনুধাবন করে নিজে কিছু করা দরকার—এই ভাবনায় মনোনিবেশ করি। বাড়িতে ডিটিপি শেখাবো চিন্তা করে একটি কম্পিউটার কিনি এবং কাজ শুরু করি। শেখানোর পাশাপাশি ধীরে ধীরে ডিটিপি-র কাজ আসতে শুরু করে এবং সেটিই একসময় জীবিকায় পরিণত হয়। ধীরে ধীরে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়ে। শেওড়াফুলি স্টেশনের পাশে একটি ঘর নিয়ে 'লেজারপ্লাস' নামে একটি ডিটিপি এবং অফসেট প্রিন্টিংয়ের প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। শনিবার 'নতুন চিঠি'-র কাজ এবং সঙ্গে 'লেজারপ্লাস'-এর কাজ। কাজের দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরতার মানসিকতা মুগ্ধ করেছিল অশোকবাবুকে। তাঁর ভাষায় এটি ছিল 'এনট্রেপ্রেনরশিপ'-এর লক্ষণ। এক শনিবার কাজের ধারা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জেনে প্রতিষ্ঠানকে আরও বড়ো করার জন্য উদ্যমী হওয়ার কথা বলেন। জেরক্স

অফসেট, আরো বড়ো ডিটিপি ইউনিট গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম'-এর কলকাতা অফিসে দেখা করতে বলেন। গিয়েছিলাম। এগিয়েও ছিল বিষয়টি। শেষমেষ বাস্তবায়িত হয়নি গড়পড়তা বাঙালি মানসিকতায়। যাই হোক, তিনি কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন আমাকে 'এনট্রেপ্রেনর' করতে। হওয়া হয়নি, এটা বাস্তব।

ইতিমধ্যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জেনেছি। জেনেছি তাঁর অনাড়ম্বর জীবনচর্যা, ভারত সেরা সমবায়ী হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা। বাংলাদেশে গিয়ে দেখে এসেছেন মুহম্মদ ইউনুসের 'মাইক্রো ফিনান্স'-এর কাজ। সেই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে গরিব মানুষকে, বিশেষ করে, মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁদের উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁদের ঋণদান করে কীভাবে স্বনির্ভর করা যায় সে-বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন।

শারীরিকভাবে অসুস্থ অশোকবাবুর কর্মস্পৃহা ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। স্বনির্ভর হয়ে কাজ করতে চাওয়া একজন মানুষের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। তাঁর কর্মস্পৃহা নিয়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদ বর্ধমান জেলা ছাত্র-যুব উৎসব হয় কালনায়। সরকারি বড়ো এই উৎসবের সমস্ত ছাপার কাজ হয়েছিল 'নতুন চিঠি' দপ্তরে। অতি অল্প সময়ে কাজ সারতে সারা রাত কাজ হয়েছিল। মনে আছে সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত যুব কর্মীরা কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সময়বুঝে, কেউ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজের কর্মী হিসেবে আমার সারা রাত কাজ করার অভ্যাস ছিল। অবাক হয়ে দেখেছিলাম ষাট পেরোনো অসুস্থ মানুষটির কর্মদক্ষতা, স্পৃহা, সারা রাত জেগে কাজ করা আর কাজ করিয়ে নেবার মানসিকতা। সময় পেরিয়েছে কলকাতার কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক নানান কাজে যুক্ত হয়েছেন তার পরও। তৈরি করেছেন কৃষি এবং পরিবেশ উন্নয়নমূলক সংস্থা।

২০১৫ থেকে তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর 'সমবায় ও মানবসভ্যতা' শীর্ষক গ্রন্থের নির্মাণ সহযোগী হিসেবে। তিনি ছিলেন আমাদের রাজ্য তথা দেশের সমবায় আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সমবায় আন্দোলনের অতীতের নানা দুর্বলতা কাটিয়ে এই আন্দোলনকে আধুনিক তথা বাস্তব ধারণার ভিতের ওপর শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি, সমাজের নানা স্তরে তা ছড়িয়ে দেবার কাজটি সার্থকভাবে করেছিলেন। পাঁচশো দশ পাতার তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থটি ছিল তাঁর 'সমবায়' ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে বিচরণ তথা তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ফসল। দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত পাণ্ডুলিপি তাঁর ল্যাপটপে কম্পোজ করে পরিকল্পনামাফিক সাজিয়ে রেখেছিলেন। ৭৮ বছর বয়সী একজন মানুষের কাজের প্রতি নিষ্ঠা, কম্পিউটারে তাঁর অনায়াস বিচরণ মুগ্ধ করেছিল। প্রায়শই বাড়িতে আসতেন লাঠি হাতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে। প্রুফ বা অন্যান্য কাগজপত্র বেশি থাকলে আসতেন বাঁধা রিক্সা করে। খোঁজ নিয়ে যেতেন কম্পোজিং, সেটিং-এর অগ্রগতি। বুঝিয়ে যেতেন নানা

বিষয়। গল্পে মাততেন মাঝে মাঝেই। একমাত্র কন্যাকে হারিয়েও নিজে ভেঙে পড়েননি বা স্ত্রীকে ভেঙে পড়তে দেননি বাস্তবধর্মী পারস্পরিক বোঝাপড়ায়। সে-কথাও বলতেন। খেতেন চিনি ছাড়া লাল চা। বিস্কুট ফেরত দিয়ে, চেয়ে নিতেন ছোট্ট বাটিতে আক্ষরিক অর্থেই একমুঠো মুড়ি।

বর্ধমানে প্রথম দিন এসে কারিগরি বিষয়ে তাঁর নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমার মুগ্ধতার কথা দীর্ঘ বছর পর জানাতে হাসতে হাসতে বলেন তাঁর কম্পিউটার প্রীতির কথা। শুনে অবাক হই যে, কম্পিউটার বা অটোমেশনের বিরোধিতায় যখন বামপন্থীরা মুখর, সে-সময় তিনি কিন্তু বুঝেছিলেন কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা। তিনি তাঁর অফিসে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু করে দেন সম-সময়েই। ভীষণ আধুনিক-মনস্ক ছিলেন তিনি। কোলকাতায় মোবাইল পরিষেবা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থায়।

'সমবায় ও মানবসভ্যতা' শীর্ষক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দুজনকেই। ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ বাড়িতে এসে ভালোবাসার স্মারক হিসেবে স্বাক্ষর করে সেই বই দিয়ে গিয়েছিলেন। বার বার শুনিয়েছিলেন, এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করার কথা। সেই বইও সেটিং করে দেবার আগাম দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতা মাঝে মাঝেই কাবু করে দিত তাঁকে। শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে গেছে 'সমবায় ও মানবসভ্যতা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ।

সমবায় আন্দোলনের কর্মী হিসেবে দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে অগ্রপথিক করেছিল সংশ্লিষ্ট কাজে। সমবায়ের সঙ্গে মানব ও মানব-সভ্যতার সম্পর্কের বিষয়টি আন্তরিকভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁর মননকে। গ্রন্থনামে ছিল তারই প্রতিফলন। মানবোন্নয়নমূলক সংগঠনকে সপ্রাণ রাখতে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অনেক ব্যক্তিমানুষকেও। ভারতের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী 'সমবায় রত্ন' হিসেবে প্রাপ্ত সাম্মানিক অর্থও যেমন সমবায় সংগঠনকে দান করেছেন তেমনই প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা থেকে শুরু করে, নিজের জমি বিক্রির টাকাও দান করেছেন বিভিন্ন সংগঠনকে।

অশোকবাবু প্রয়াত হয়েছেন ২৯ মার্চ ২০২০। তার মাত্র কয়েকদিন আগেও শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতি এবং একটি সংগঠনকে সচল রাখতে অর্থ প্রদান করেছেন। মরণোত্তর দেহও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বার্থে দান করার অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন সেই দেহ দান করতে এ দৃশ্য বিরল। অশোকবাবুর মার্চ মাসের শেষ পেনসনের অর্থও তাঁর স্ত্রী দান করেছেন করোনা-দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে। বিরল মানুষ তাঁরা দু-জনেই। অশোকবাবুর মতো মানুষদের মনে রাখতে হয়, ভবিষ্যৎ মনে রাখে।

লেখক : *আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানী ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

এক আলোর মানুষ অশোকদা

মলয় রায়

অশোকদা। সবার প্রিয় অশোকদা। সরল মাটির মানুষ। হো-হো করে হেসে যেমন উঠতেন, কথায়-কথায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনাও থাকত।

মানুষকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি কমিউনিস্ট। মতাদর্শ ও নীতিবোধের পাশাপাশি মূল্যবোধ। সব মিলিয়ে ছিলেন আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

২০১১-র পরবর্তী সময়টায় সমাজজীবনের ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে। সমবায় ভারসাম্যহীন অবস্থায়। কোথাও জং ধরেছে। কোথাও দেয়াল ভেঙে পড়েছে। কোথাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই সময়টা অনেক সহ্য করেও ছিলেন ধীরস্থির। লিখেছেন সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস। প্রকাশিত হলো 'সমবায় ও মানব সভ্যতা'। অশোকদা বুঝতেন, উত্তেজনা মানুষের শক্তির পক্ষে সহায়ক নয়। তিনি ছিলেন ধৈর্য আর প্রতিজ্ঞার উদাহরণ।

সামাজিক আচার-আচরণে সব সময়ই নির্মম ছিলেন এমনটা নয়। শ্রীধরপুরের আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও পৈতে তাঁর দেখিনি। মেয়ের জন্য

হিন্দুধর্মের সামাজিক রীতিনীতিকে তোয়াক্কা করেননি। আবার দেখেছি অজ পাড়াগ্রাম, রায়না থানার হিজলনা গ্রামে বোনের কাছে ভাইফোঁটা নিতে কোনো কিন্তু ছিল না। আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করেই ফোন করে জানিয়ে দিতেন 'আমি যাচ্ছি'।

এই আমাদের অশোকদা। নতুন চিঠি-র প্রিয় মুখ। প্রিয় মানুষ। এক যন্ত্রণা কষ্ট তিনি দাঁতে দাঁত চেপে হজম করেছেন। তোতার প্রথম বিয়ে টেকেনি। দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবার পর সেও এক যন্ত্রণা। তোতা, কমলদা, ভাই সনৎ, ভাইপো সোমা... পরপর এত প্রিয়জনের মৃত্যু তাঁকে কাজ থেকে বিরত করতে পারেনি। চঞ্চল করে তুলতে পারেনি।

তাঁর কাছে 'আমি' মানেই ছিল সিপিআই(এম) পার্টি। 'আমার এ কাজটি করা উচিত ছিল' বললেই বুঝতে হতো পার্টির এই কাজটি করা উচিত ছিল। পার্টি আর ব্যক্তি মানুষ এই ভাবেই একাত্ম হয়ে উঠেছিল। পার্টি-বিরোধী কোন কথা তিনি বরদাস্ত করেননি।

ভাবতে কষ্ট হয় তাঁর মতো মানুষের সান্নিধ্য আর পাব না। তিনি এক আলোর মানুষ। তাঁকে নিয়ে বলতেই হয় "যে মৃত্যু মৃত্যু নয়/আগুন ঝরা হাঁটা পথে/সে মৃত্যু জীবন জয়ের স্বপ্ন গাথা/সে এক অন্য মানুষ/যাকে দেখে স্মৃতি ফিরে পায়/স্মৃতিভ্রষ্ট রাজপথ।"

অশোক ব্যানার্জী মানে এক আগুন বংশধর। সমবায়ের আলোয় উদ্ভাসিত এক আলোর মানুষ।

লেখক : *কবি ও ছড়াকার। প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ।*

নতুন চিঠি-র অভিভাবক অশোকদা অমর রহে

কিশোর মাকর

নিজের জীবনচর্চায় কমিউনিস্ট, নীতিনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, নতুন চিঠির অভিভাবক অশোকদা আর নেই। ২৯ মার্চ ৮৩ বছর বয়সে জীবনযুদ্ধে হেরে যান। রোগাক্রান্ত শরীর এবং একের পর এক মানসিক আঘাতকে জয় করে কীভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে এগিয়ে নিয় যেতে হয় তা আজকের প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছেন। কাজ-পাগল মানুষটিকে গত দু'বছর কাজ করতে না-পারার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছিল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বারে বারে থমকে দিয়েছে অনেক না-পারার স্বপ্ন। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পালা বদল হওয়ার পর নানান বিতর্ক হয়েছে নতুন চিঠিতে। যেটুকু নির্যাস জানতে পেরেছি, সরকারে থাকার জন্য কমিউনিস্টদের জন্ম হয়নি। মানুষের পাশে থাকা, বিপদে আপদে লেপ্টে থাকতে পারলেই মানুষ পথ বেছে নেবে। সিপিআই(এম) দল যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে তখন তা সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। অনেক পালক জুটেছে তাঁর মুকুটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টি।' যোগ্যতার শিখরে পৌঁছেছিলেন।

যোগ্যতার শীর্ষে থাকা মানুষটির সংস্পর্শে আসি ১৯৯২ সালে। ১৯৯০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল, আমি লেটার প্রেস প্রিন্টিং কোর্স করি। ওখানেই জহুরদার সঙ্গে আলাপ। তিনি নতুন চিঠিতে কাজ করার কথা বলেন— অশোকদার সঙ্গে দেখা করবে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর পড়াশোনা এবং লিখতে

পার? সন্তুষ্ট হয়ে কাজে যোগ দিতে বলেন। আমি এবং ফজলুল কাজে যোগ দিলাম। একমাস পরেই ম্যানেজার করে দিলেন। স্যার জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের গাইডেন্সে সংবাদ লেখা, ম্যানেজারের কাজে উত্তীর্ণ হলাম। দিনেশ আমার আগেই নতুন চিঠিতে এসেছে। তার সাহচর্যে অনেক জেনেছি, সহযোগিতা পেয়েছি। ইমানুলের সাহচর্যে সংবাদ লেখা শিখেছি। চাকরি পাওয়ার পর পার্থ ও দিনেশ যোগ্যতার সঙ্গে নতুন চিঠি-কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তখন প্রেস নতুন চিঠি দপ্তরেই ছিল। পরেশদা, বিনয়দা, বৈদ্যনাথ, লক্ষ্মী, দুখদেব, সকলেই নতুনচিঠি অন্তপ্রাণ। বৈকালিক টিফিন খবরের কাগজ পেতে একসঙ্গে খাওয়া হতো যা আজও নস্টালজিয়া।

এখন শোনাতেন কাজ না করে পদে থাকা যায় না। আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক। একাকীত্ব যাতে গ্রাস করতে না পারে তার জন্য পার্টির নেতা ভূতিদার বাড়িতে চলে আসেন। সবার মানা না শুনে বেরিয়ে পড়তেন পার্টির কর্মসূচিতে। চলার শক্তি না থাকলেও লাঠি নিয়ে হাজির হতেন। তাঁর জীবনশৈলী অনুকরণীয়। ৬০০ সুগার, প্রেশার, পারকিন্সন, সমস্ত অর্গান জবাব দিচ্ছে। তাতেও কীভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় তা শিখেছি। এর জন্য সমস্ত কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন গৌরী বৌদি। তিনি যদি জীবনসঙ্গিনী না হতেন অশোক ব্যানার্জীও অশোকদা হতে পারতেন না। একামাত্র সন্তানের অকালে চলে যাওয়া, নানা ঘাত প্রতিঘাত টলাতে পারেনি আদর্শকে। তেমনি অকুতো সাহস। নতুন প্রজন্মকে স্যালুট দিতেই হবে দুজনকেই।

২০১১ সালের পর নতুন চিঠি নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে। স্যারকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে বিকল্প পথ বার করেন। যাঁরা ভেবেছিলেন নতুন চিঠি বন্ধ হবে তাঁদের মুখে ছাই দিয়ে লকডাউন-এর আগে পর্যন্ত একটি সংখ্যাও অপ্রকাশিত থাকেনি। জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন চিঠি ঠিক সময়ে প্রকাশ করেছেন। সম্পাদক স্যার অশোকবাবুর ওপর ভরসা রাখতেন। অরুণদা, অশোকদা, স্যার আমাদের অভিভাবক। একজন চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর আদর্শ, চলার পথ। আদর্শের উত্তরাধিকারী হওয়া কঠিন কাজ। আপনি শান্তিতে ঘুমান। যাদের হাতে ব্যাটন তুলে দিয়ে গেলেন আপনার হাতে তৈরি নতুন চিঠি-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, শক্তি দিন বয়ে নিয়ে যাওয়ার।

লেখক : *বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

এক প্রবীণের যুবমনের সান্নিধ্য

মুরারী মণ্ডল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি, পাশাপাশি থেকে তাঁর অভিভাবকত্বের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা বুঝবেন কেমন অভিভাবক ছিলেন তিনি। নতুনদের মন জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল অশোকদার। তাঁর মৃত্যু নিছক কাজপাগল, মতাদর্শের জ্বলন্ত উদাহরণ নীতিনিষ্ঠ এক প্রবীণের ঠিকানাহীন দেশে পাড়ি দেওয়া নয়। এমনকি নতুন চিঠির প্রকাশক, অভিভাবক সাংবাদিকের প্রয়াণও নয়। তাঁর এই চলে যাওয়া একটা জগৎ শূন্য হয়ে যাওয়া। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কথায়, ভাবনায়, প্রজ্ঞায় ভরে রাখতেন আমাদের এই জগৎটাকে।

তাই তাঁর মৃত্যু সংবাদে ভেঙে পড়িনি। বইয়ের আলমারি ঘেঁটে খুঁজে বের করি 'তথ্য কথা বলে' পুস্তিকা। প্রতিটি নির্বাচনের আগে যেটা মূলত অশোকদার উদ্যোগে প্রকাশ হতো। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত নানা ভাষার পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে খুঁজে তথ্য সংগ্রহ করে একত্রিত করণের সংকলন। যা একনজরে ভারতদর্শন হয়ে যেত। খুব জনপ্রিয় ছিল নেতৃত্বস্থানীয়দের কাছে। আমরা যোগাড়ে হিসাবে রাজমিস্ত্রি অশোকদাকে সাহায্য করতাম।

অশোকদাকে চিনি আমার পড়াবেলা ১৯৮৪ সাল থেকে। জে বি মিত্র রোডের ভাঙা বাড়ির দোতলার অন্ধকার কুঠুরিতে রায়না এলাকার দু-চার লাইন খবর নিয়ে হাজির হতাম মাঝেমধ্যে। ওই সময় লোকসভার মধ্যবর্তী নিবাচনে দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হন খণ্ডঘোষের বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র মালিক। স্বাভাবিক নিয়মে খণ্ডঘোষ বিধানসভা ফাঁকা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থী শিবপ্রসাদ দলুই। অশোকদা 'সত্যযুগ' পত্রিকার করেসপন্ডেন্ট হিসাবে উপনির্বাচনে খণ্ডঘোষ কেন্দ্রের রিভিউ করবেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, "প্যাড নে, আমি বলে যাচ্ছি শুনে শুনে লেখ।" শুরু হল লেখা। ভয়ে এ অর্বাচীনের হাত কাঁপতে থাকে। পাতাখানেক লেখার পর উপস্থিত ফটিকদা ওরফে দিলীপ রাউত। অশোকদা ওকে লেখার জন্য বলেন। ফটিকদা বলেন, 'বেশতো লিখছে ও'। অশোকদা বলেন, "ও তো নতুন, দেরি হচ্ছে। আমি একটু বেরুব। তুই বাকিটা লেখ"। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি সেদিনের মতো ফটিকদাকে ছেড়ে দিয়ে। পরে আমি 'সত্যযুগ'-এর আরামবাগ সাবডিভিশনের করেসপন্ডেন্ট নিযুক্ত হই। সত্যযুগের প্রকাশনা বন্ধ হলে কর্মচারী শিল্প সমবায়ের

সদস্য। আধুনিক প্রযুক্তির নতুন মেশিন ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রয়োজন। অশোকদা তখন ওয়েস্টবেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। সত্যযুগের তরফে আমার উপর খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িত্ব বর্তায়। ফোনে যোগাযোগ করলে উনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে সময় দেন। নির্দিষ্ট দিনে আমরা ছয় জনের টিম ওনার অফিসে উপস্থিত। একান্ত আন্তরিকতায় আপ্যায়ন করে বসিয়ে অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেন, "আইন অনুযায়ী যতটা পরিমাণ টাকা দেওয়া যায় দ্রুততার সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।"

সেই ঋণ অনুমোদনের পরই 'সত্যযুগ কর্মচারী শিল্প সমবায় সমিতি' বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দ্রুত এগোতে থাকে। আজও তার অগ্রগতি অব্যাহত।

আমি কলকাতা ঘুরে সাধনা প্রেস ও নতুন চিঠির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। অশোকদাও রাজ্যস্তরের নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব সামলে নতুন চিঠি-তে প্রত্যাবর্তন করেন। আবেগ, উদ্দীপনায় যে কোনো যুবককে হার মানিয়ে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত নতুন চিঠি-র জন্য কাজ করে গেছেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কোনোদিন ফুরোবেন না। অশোকদা অমর থাকবেন আমাদের হৃদয়ে।

লেখক : *বিশিষ্ট লেখক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*

কিছু স্মৃতি—কিছু কথা

আব্দুস সবুর

অশোকদার সাথে আমার পরিচয় তিনি যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। ১৯৭৩ সালে। পরবর্তীকালে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা অফিসে কাজে যোগদানের পর ঘনিষ্ঠতা। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হওয়ার পর মাঝে মাঝে কোলকাতায় যাওয়া হতো আর অশোকদার সাথে কথা হতো। তিনি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নেওয়ার পর মাঝে মাঝে নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে এলে কথা হতো। পত্রিকাতে প্রায় আমার কিছু লেখা প্রকাশিত হতো। মাঝে কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি। একদিন অশোকদা ডাকলেন—মামা, তুমি পত্রিকাতে লেখা বন্ধ করলে কেন, লেখো, তবে সূত্রগুলি দেবে। ২০১১ সালের পর আমাদের 'আজকের চিঠি' অফিসে কবিতার আসর বসতো। তাতে অশোকদা সভাপতি থাকতেন এবং বলতেন—মামা, তোমার লেখা কবিতাটি পাঠ করো। এইভাবে চলতো। অশোকদা সমবায় বিষয়ে নিয়ে একটি বই 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' প্রকাশ করেন। একদিন অশোকদাও বললেন—মামা, তোমাকে বহরমপুর যেতে হবে। প্রায় আড়াইশো বই নিয়ে বাসে করে বহরমপুরে সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে দিয়ে আসি।

১৯৭০ সালে জুন মাসে অশোকদা গুণমনি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। অশোকদা বর্ধমান, দুর্গাপুর জেল হয়ে শেষে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হন। অবশেষে ১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ছাড়া পান। সেই সময় অশোকদা থাকতেন কেশবগঞ্জ চটির পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ইউনিভারসিটি কোয়ার্টারে। আলিপুর কোর্টে যাওয়ার বিষয়ে প্রায় অশোকদার কোয়ার্টারে যাওয়া। তখন অশোকদা জেলে। গৌরী বৌদির সাথে দেখা হতো এবং কোর্টে যাওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা হতো। গৌরী বৌদি বাড়িতে না থাকলে অশোক ব্যানার্জীর মামাতো ভাই কালিপ্রসন্ন মুখার্জীর সাথে কথা হতো।

সেই সময় সাঁইবাড়ি কেসে ও অন্যান্য কেসে জেলে রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন অনেকে। এখন সব নাম মনে পড়ছে না। যতটুকু মনে পড়ছে তা হল বিনয় কোঙার, সুধীর রায়, দিলীপ দুবে, কালিশঙ্কর পাল, সামাদ, অমল দাস, বিমল দাস, মন্টু নন্দে, টিলু মুখার্জী, বংশী দত্ত সহ অনেকে। নাম না জানা সিপিআই(এম) সদস্য ও কর্মীরাও বন্দি ছিলেন।

যতদূর মনে হয় ১৯৭৩-৭৪ সাল আলিপুর যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়। দুর্গাপুজোর পর কোর্ট খুলছে। সবাই মিলে আলিপুর কোর্টে যাওয়া যাবে। সেই সময় ঠিক হলো কেউ লোকাল ট্রেনে যাবে কেউ কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে যাবে। তখন বর্ধমান-হাওড়া সুপার ট্রেন ছিল না। স্টেশনে একে একে জড়ো হলাম—ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শক্তি চ্যার্জীর স্ত্রী জয়ন্তী চ্যাটার্জী, মন্টু নন্দের স্ত্রী দীপালি নন্দে ও তার দুই বাচ্চা মেয়ে মনু ও রুনু এবং বংশী দত্ত-এর মা পান্নাময়ী দত্ত, বোন পূর্ণিমা ও বৌদি কবিতা দত্ত, বারীন ঘোষ ও আমি। যথারীতি ট্রেনে হাওড়া পৌঁছে আলিপুর কোর্টে হাজির হলাম।

আলিপুর কোর্টে মেমারির মহারাণী কোঙার, গৌরী ব্যানার্জী সহ অনেকের সাথে দেখা হলো। বেলা ১২টা হবে। প্রিজন ভ্যানে করে রাজনৈতিক বন্দিদের নিয়ে আসা হলে, ভ্যানের সামনে গিয়ে দেখা হয় এবং কথাবার্তা হয়। সেই সময় বারীন ঘোষ আমাকে বলেন, কিছু বিড়ি ও দেশলাই দিয়ে আয়। আমি যথারীতি বিড়ি কিনে নিয়ে বারীনদার হাতে দিই। বারীনদা প্রিজন ভ্যানের ফাঁক দিয়ে বিড়িগুলি নিয়ে নেন। সেদিন কোর্টে কেস না ওঠার জন্য বন্দিদের ফের আলিপুর জেলে নিয়ে যায়। আমরা আলিপুর কোর্ট থেকে আলিপুর জেলের সামনে হাজির হলাম বেলা ১টার সময়। আগেই জেলখানায় দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম দেখা করার জন্য। তারপর একে একে জেল-গেটে হাজির হলেন মহারাণী কোঙার, গৌরী বৌদি সহ আরও অনেকে। দীর্ঘ সময়ের পর রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হলো। একটা সরু গলির মতো জায়গা, সামনে রড ও নেট দিয়ে ঘেরা,

আবার সামনে কাচ দেওয়া। ঠিক সিনেমা হলের টিকিট কাউন্টারের মতো। জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে। সবাই কথা বলার পর আমরা জেলের মেন গেটের সামনে হাজির হলাম। যে যার প্রিয়জনের জন্য কিছু খাবার ও জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। তা গেটের সামনে সেন্ট্রিদের হাতে তুলে দিলেন। মহারাণীদি কিছু নারেকল নাড়ু ও নারকেল নিয়ে গিয়েছিলেন। নারকেলগুলি ফাটিয়ে ফাটিয়ে রাখাতে আমরা প্রতিবাদ করলাম। এগুলির মধ্যে কি বোম আছে নাকি ! দু-একটা ভেঙেছেন... আর ভাঙবেন না। ওগুলো ভাঙলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন জেলের সেন্ট্রিরা আর ভাঙলেন না। কারারক্ষীরা নারকেল ভাঙা বন্ধ করে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। জয়ন্তী চ্যাটার্জী তার ভাই টিলু মুখার্জীর সাথে দেখা করার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বাইরে নিয়ে এসে জল খাওয়ানোর পর বলি, একটু শান্ত হোন। যথারীতি যে-যার মতো নিজেদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আসার আগে আমার বাবা প্রয়াত হন। তখন আমাকে বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। তারপর দীর্ঘ সময় সবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। স্মৃতি সব সময় ফুলের রেণু হয়ে বিছিয়ে থাকে হৃদয়ের জানালায়।

লেখক : *প্রবীণ সাংবাদিক।*

কমিউনিস্ট অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

কাজী আবদুল করিম

১৯৩৮ : বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার কালনা শহরে ১৯৩৮ সালের ৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা করুণাময়ী দেবী। পিতা কালীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায় দপ্তরের পরিদর্শক। তাই চাকরির সূত্রে জেলার বিভিন্ন জায়গায় বাসা বাঁধতে হতো। বাড়ি মেমারি-২ ব্লকের শ্রীধরপুর গ্রামে।

১৯৫৫ : গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করে ভাতাড় থানায় মামার বাড়ি কুবাজপুর থেকে ভাতাড় মাধব পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সাফল্যের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বীরভূমের সিউড়ি কলেজে ভর্তি হন ১৯৫৫ সালে। এখানেই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বদলি নিয়ে বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হন।

১৯৬০ : রাজ কলেজে পড়াশুনা শেষ না করেই প্রথম গঙ্গাটিকুরি ব্লকে চাকরি তারপর মেমারি ব্লক। পরে বর্ধমান সদরের রায়ান স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। স্থানীয় মানুষের কাছে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনিও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য হয়ে শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত হন। পাশাপাশি স্থানীয় বামপন্থীদের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনেও অংশগ্রহণ শুরু করেন।

১৯৬৪ সালের ১১ আগস্ট তাঁর বিবাহ হয় শিক্ষিকা গৌরী ব্যানার্জীর সঙ্গে। গৌরী ব্যানার্জীর জীবনটাও ছিল সংগ্রামের। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পড়াশুনা। কলেজে পড়ার সুযোগ নেই তাই প্রাইভেটে বি.এ. পাস করেন। মাধ্যমিক পাস করে প্রথমে মেমারিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর প্রাইভেটে বি.এ. পাস করে গলসী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালের ২ আগস্ট তাঁদের একমাত্র কন্যা (তাদের ১১ পুরুষের পরিবারে প্রথম কন্যা সন্তান) তোতার জন্ম হয়। নাম রাখা হয় অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মেমারি ব্লকে কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় পরিচিত হন কৃষক নেতা বিনয় কোঙার এবং কাশী হাজরা চৌধুরীর সঙ্গে। কাশীবাবুর সঙ্গে কৃষক আন্দোলনে বিভিন্ন জয়গায় কর্মসূচিতে যোগ দিতেন।

১৯৬৬ সালে শিক্ষক নেতা আমোদবিহারী বসুর সঙ্গে শিক্ষক আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং একমাস জেল হয়। এক মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্কুলে যোগদান করতে যান। স্থানীয় কংগ্রেসিরা তাঁকে যোগদান করতে দেয় না।

স্কুলের শিক্ষকতার ছেদ ঘটাতে পারলেও এলাকার কৃষক আন্দোলন থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি। তিনি স্থানীয় বামপন্থী কর্মীদের সঙ্গে (পূর্ণ মালিক সহ অন্যান্য) যুক্ত হয়ে বেনামি ও খাস জমি উদ্ধারের লড়াইয়ে অংশ নেন। এই সময় তিনি বহু জায়গায় কাজ করেছেন। দোকানে খাতা লেখা থেকে শুরু করে নানা কাজ। ভাটাকূল স্কুল গড়ার কাজেও সংগঠক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত থেকেছেন।

১৮৬৭ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক, পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক সুবোধ চৌধুরীর নজরে আসেন। অশোক ব্যানার্জী পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে অর্থ বিভাগে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী আন্দোলনের নেতা মৃদুল সেন, অমল ব্যানার্জী, মধুসূদন ব্যানার্জীর সঙ্গে। এম. এস. আসগর, মৃদুল সেন, অমল ব্যানার্জী, মধুসূদন ব্যানার্জী এবং অশোক ব্যানার্জীকে (৪ জনকে) নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের মধ্যে পাটি শাখা তৈরি হল। এঁদের উদ্যোগে সেই সময় তৈরি হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অন্বেষা'। বর্ধমানে প্রথম গ্রুপ থিয়েটার।

১৯৬৮ : ১৯৬৮ সালের ১৪ মার্চ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ (মৃত্যু ১৯৩৬ সালের ১৯ জুন) তৈরি হল গোর্কি শতবর্ষ কমিটি। সেই কমিটির উদ্যোগে সেমিনার, নাটক উদ্‌যাপিত হয়। অশোক ব্যানার্জী, মৃদুল সেনরা অমল ব্যানার্জীর পরিচালনায় 'নীচের মহল' নাটক অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'অন্বেষা' কাজ শুরু করে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে 'রক্তে রোয়া ধান', 'জোট বাঁধো তৈরি হও' এবং 'হারানের নাতজামাই' নাটক মঞ্চস্থ হতে শুরু করলো। অশোক ব্যানার্জী এবং গৌরী ব্যানার্জীর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করতো।

কেশবগঞ্জ চটীর কমল সায়রের পাড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে বাস শুরু হলেও অশোক ব্যানার্জী শ্রীধরপুরের মাটি ছাড়েননি। রক্তে ছিল সমবায়। শ্রীধরপুরের সমবায় ব্যাঙ্কটি শতাধিক কালের। সেই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হন এবং সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সমবায়মুখী করতে শুরু করেন।

১৯৬৯ : প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট। গ্রামাঞ্চলে জমির আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। 'অন্বেষা' সংস্থার নাটকগুলি গ্রামেগ্রামে নিয়ে গিয়ে কৃষক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করলো। ১৯৬৯ সালের ২২ জুন চৈতন্যপুরের রায়চৌধুরীদের লুকিয়ে রাখা জমি উদ্ধারের আন্দোলনে শহিদ হলেন পাঁচকড়ি মাঝি এবং বনমালী কুশমেটে। আহত সমর বাওড়া সহ অনেক নেতা কর্মী।

পরদিন বর্ধমান জেলা জুড়ে হরতাল এবং বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়, 'অন্বেষা সংস্থা' মন্তেশ্বর থেকে নাটক করে ফিরছিল। কুড়মুনে আটকে যায়। সেখানেই রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করেন কৃষক নেতা দেবব্রত দত্ত। সন্ধ্যায় হ্যাচাক জ্বালিয়ে 'হারানের নাতজামাই' নাটক শুরু হয়। নাতজামাই চরিত্রে অশোক ব্যানার্জী একাত্ম হয়ে যেতেন। পুলিশের তাড়াখাওয়া আত্মগোপন করে থাকা এক বলিষ্ঠ কৃষকের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বাস্তবে রূপ পেত। সেই সঙ্গে 'ময়না' চরিত্রটিও ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর স্ত্রী গৌরী ব্যানার্জী। বাচ্চা মেয়ে তোতাকে কোলে নিয়ে তারা নাটকের দলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নাটক আর গণসঙ্গীত গেয়ে বেড়াতেন। ধীরে ধীরে তোতাও কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর সদরের বড়শুলে সারা ভারত কৃষকসভার সর্বভারতীয় ২০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত থেকে আসা প্রতিনিধিদের সামনে মঞ্চস্থ করা হয় 'হারানের নাতজামাই' নাটকটি, কৃষক নেতৃত্ব অভিভূত। উপহার হিসেবে 'অন্বেষা' পেল একটি হারমোনিয়াম, যার অভাব ছিল এতদিন!

১৯৭০ : সারা পশ্চিমবঙ্গে জমির আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছে। কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ভূমিসংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী। খাসজমি, বেনামি জমি উদ্ধারের ডাক দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর পছন্দ নয় জোতদারদের কাছ থেকে বেনামি জমি উদ্ধার আন্দোলন, তাই তিনি প্রকাশ্যে তাঁর সরকারকেই 'অসভ্য, বর্বর সরকার বলে' মন্তব্য করলেন। সরকার ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপাল ধরমবীরের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। ১৭ মার্চ রাজ্য জুড়ে পালিত হয় হরতাল। সেইসঙ্গে মিটিং মিছিল। সিপিআই(এম) দলের একটি মিছিল বর্ধমানের সাঁইবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বোমা পড়ে। সেই নিয়ে অশান্তি ঘটে যায় অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। মৃত্যু হয় তিনজনের। শহর জুড়ে বামপন্থী কর্মী নেতাদের উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার, পুলিশ হেফাজত, জেল-হাজতবাস। অনেক নেতা কর্মীকে তাদের চাকরির জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হল না। অশোক ব্যানার্জীও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির জায়গায় ঢুকতে পারলেন না। আত্মগোপন করে থাকলেন হট্টদেওয়ানে নীলকণ্ঠ দত্তর বাড়িতে।

একদিন সিমডালের এক সাঁওতাল পাড়ায় অশোক ব্যানার্জী আত্মগোপন করে আছেন। এক বৃদ্ধা সাঁওতাল মহিলা এসে অশোক ব্যানার্জীকে বলেন, 'পুলিশ আসছে, জামা কাপড় সব খুলে ফেলে গামছা পরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পর।' গায়ে ছাইধুলো মাখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা জননী তার মুখে মদ ছিটিয়ে দেন। অশোক ব্যানার্জী বেহুঁসের মতো খাটিয়ায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকেন। পুলিশ আসে, মদের গন্ধ পেয়ে রুমাল চাপা দিয়ে অশোক ব্যানার্জীকে দেখে বলে এখানে কি ভদ্রলোক থাকতে পারে। চল অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। সেদিনের সেই বৃদ্ধা মহিলার উপস্থিত বুদ্ধিতে অশোক ব্যানার্জী পুলিশের নজর এড়াতে পেরেছিলেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। রায়ানের কংগ্রেসিরা তাদের বেনামি জমি যা

কৃষকসভার নেতৃত্বে গ্রামের গরিব মানুষরা চাষ করেছিল সেই ধান কাটার তোড়জোড় শুরু করে। পুলিশ ক্যাম্পের সাহায্য নেয়। কৃষকনেতা রামনারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে গ্রামের গরিব কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে জমির ধান রক্ষার লড়াইয়ে নেমে পড়ে। অশোক ব্যানার্জী, পূর্ণ মালিক সেই আন্দোলনে যুক্ত হন। সি.আর.পি.এফ-রা যখন রামনারায়ণ গোস্বামীকে ধরে মারধর করছিল তখন মহিলা কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই মহিলা দলে রামনারায়ণ গোস্বামীর স্ত্রী লতিকা গোস্বামীও ছিলেন। তাঁরা রামনারায়ণ গোস্বামীকে উদ্ধার করে অশোক ব্যানার্জীর সাইকেলের রডে বসিয়ে দেয়। অশোক ব্যানার্জী সাইকেল চালিয়ে তাঁকে গোপন আস্তানায় রেখে ফেরার পথে কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডা ও পুলিশের হাতে পড়ে যান। তারা অশোক ব্যানার্জীকে মারধর করে। কৃষকনেতার গোপন ঠিকানা জানতে চায়। অশোক ব্যানার্জী মুখ না খোলায় প্রচণ্ড মারধর করে। হাত দুটি দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশের জিপের পিছনে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় পুলিশ ক্যাম্পে। সেখান থেকে পুলিশ লকআপে নিয়ে গিয়ে আবার মারধর করা হয়। হাত দুটি ভেঙে যায়। শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড চোট লাগে, পা দুটিও পুলিশি অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তাঁর দলাপাকানো দেহটি নিয়ে গিয়ে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়। হাসপাতালের বেডেই তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। যে পুলিশ কর্মীটি প্রহরায় ছিলেন, তিনি জানতে পারেন। গুণ্ডাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল একজন পুলিশ যখন ডিউটি বদল করবে আর অন্য পুলিশ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আসবে সেই ফাঁকে হত্যা করা হবে। পুলিশ কর্মীটি তাই দায়িত্ব বদল না করে সর্বক্ষণের জন্য থেকে যান এবং অশোক ব্যানার্জীকে রক্ষা করেন। অশোক ব্যানার্জী সেই পুলিশ কর্মীকে পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন সেই পুলিশ কর্মীর দাদাও বামপন্থী আন্দোলন করতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন। তাই তিনি আর এক দাদাকে হারাতে চাননি। খুন হবার আশঙ্কার কথা কোর্টে জানিয়ে কোর্ট থেকে অর্ডার করিয়ে জেলখানায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁকেও গুণমণি রায় হত্যা মামলায় যুক্ত করা হয়েছিল। হাত-পা প্লাস্টার আর ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দীর্ঘদিন তাঁকে জেলখানায় শুয়ে থাকতে হতো। কৃষক নেতা রামনারায়ণ গোস্বামীকেও গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আনা হয়। বিনয় কোঙার কয়েকজন জেলবন্দি কর্মীকে অশোক ব্যানার্জীকে দেখাশুনার জন্য দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেন। ধীরে ধীরে অশোক ব্যানার্জী সুস্থ হতে থাকেন। একটু একটু করে দাঁড়াতে পারছেন। ডাক্তারবাবু নির্দেশ দেন হাঁটতে হবে। সেই সময় বামপন্থী আন্দোলন করার অপরাধে তিনমাসের জন্য 'মিশা' আইনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আসেন গোপাল হালদার (অমল হালদারের বাবা), সুঠাম চেহারা। তিনি প্রতিদিন অশোক ব্যানার্জীকে হাঁটাতেন। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে অশোক ব্যানার্জী আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতেন।

একদিন গভীর রাতে অশোক ব্যানার্জীর চোখে ঘুম নেই, নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় একটা স্নেহের হাত তাঁর কাঁধে এসে পড়ল। শিহরিত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন বিনয় কোঙার দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন

"কী তোতাকে মনে পড়ছে? গৌরীর জন্য মনখারাপ? তারপর আশ্বস্ত করে বলেছিলেন পার্টি তো আছে, চিন্তা কোরো না পার্টির লোকজন ঠিক নজর রাখবে।" সেই স্নেহের হাতের স্পর্শ এবং কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি ঘুমাতে গেলেন।

একদিন শুনলেন এক সাঁওতাল বৃদ্ধা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। পুলিশ তাকে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছে না। শুনে জেলখানার গেটে চলে আসেন, দেখেন সিমডালের সেই সাঁওতাল বৃদ্ধা জননীকে। হাতে একটি মুড়ির ঠোঁঙা এবং দুটি আলুর চপ। দু'জন দুজনকে দেখে মা-ছেলের মতো কি কান্না! সে এক গভীর অনুভূতি!

জেলখানায় থাকার সময় তিনি বন্দিদের নিয়ে সাংস্কৃতিক দল তৈরি করেন তাঁরা 'বাঘের খাঁচা' এবং 'আট ঘন্টার লড়াই' নাটক করেছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বর্ধমান, দুর্গাপুর, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলখানায় কাটিয়ে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখে গুণমণি হত্যা মামলা থেকে বেকসুর মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরলেন। এই মামলায় যে ৭জনকে আসামী করা হয়েছিল এঁরা হলেন অমল দাস, বিমল দাস, কালিশংকর পাল, আবদুস সামাদ, অশোক ব্যানার্জী এবং মন্টু নন্দে। এই সাতজনই মুক্তি পায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত মস্তান বাহিনীর হুমকির জন্য কোয়ার্টারে থাকা নিরাপদ নয় বলে পার্টির নির্দেশে সদরের বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন করতে হলো। এই সময় তিনি 'সত্যযুগ' পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন। এই সময় তাঁর পরিবারের করুণ অবস্থা। তাঁরা তোতার মুখে একফোঁটা দুধ তুলে দিতে পারতেন না। তাঁর কাকিমা তার ৮ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানেই থাকতেন। কয়েকজন কমরেড আত্মগোপন করে থাকেন। কালীপ্রসন্ন মুখার্জী, নিরুপম সেনও প্রায় থাকতেন আর ২৪ পরগণা থেকে আসা কমল গায়েনও পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। পোড়লের ঝোল, জলের মতো ডাল আর ভাত ছিল নিত্যদিনের আহার!

১৯৭৭ : সেইসব কঠিন দিন পার করে, জরুরি অবস্থার অবসানের পর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কেন্দ্রে জনতা দলের সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হল। অশোক ব্যানার্জী সহ অপরাপর নেতা-কর্মীরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে কাজে যোগ দিলেন। কর্মচারীরা সমস্ত ভয় ভীতি কাটিয়ে সদরে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রতিহিংসাকে স্থান না দিয়ে তাঁরাও সকলকে কাছে টেনে নেন। ১৯৫৫ সাল থেকে প্রকাশিত হওয়া পার্টি পরিচালিত 'নতুন পত্রিকা' ৭০ দশকে বন্ধ হয়ে যায়। সাঁইবাড়ি মামলায় নতুন পত্রিকার সম্পাদক সুশীল ভট্টাচার্যকে আত্মগোপন করে চলে যেতে হয়। ধীরেন সুর ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত শ্রীলেখা আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশ করতে পারলেও পুলিশী নির্দেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সেই পত্রিকাকে পুনর্জীবিত করার কথা প্রথমে বলা হলেও পরে সিদ্ধান্ত হয় ওই পত্রিকা 'নতুন চিঠি' নাম দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হবে। পার্টির সে সিদ্ধান্ত মতো অশোক ব্যানার্জীকে সম্পাদক ও প্রকাশক করে

১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'নতুন চিঠি' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হলো। সত্যযুগ পত্রিকার সাংবাদিকতা ছেড়ে তিনি নতুন চিঠি পত্রিকা প্রকাশনায় মন দিলেন। স্কুলবোর্ডের সিদ্ধান্ত মতো ১৯৮১ সালে তার মুখপত্র 'শিক্ষা সমাচার' পত্রিকার সম্পাদক হন অশোক ব্যানার্জী। নতুন আঙ্গিকে শিক্ষাসমাচার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৮১ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) বর্ধমান জেলার ত্রয়োদশ সম্মেলন কাটোয়া শহরে সুবোধ চৌধুরী নগর, রবীন সেন মঞ্চে ৯-১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে অশোক ব্যানার্জী জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কৃষকসভার জেলা ও প্রাদেশিক কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৮২ সালে রামনারায়ণ গোস্বামী দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রী হন। তাঁর আপ্ত-সহায়ক হিসেবে অশোক ব্যানার্জী নিযুক্ত হন। পরে রামনারায়ণ গোস্বামী স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অশোক ব্যানার্জী আপ্ত সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক কাজের জন্য 'নতুন চিঠি' পত্রিকার প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজের অসুবিধা হচ্ছিল, তখন সাময়িকভাবে নিরুপম সেন সেই দায়িত্ব নেন।

১৯৮৫ : পার্টির ডাকে আপ্ত সহায়কের দায়িত্ব ছেড়ে বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আসেন। দক্ষতার সঙ্গে সমবায় আন্দোলনে যুক্ত হন। তাঁর রক্তে ছিল সমবায় আন্দোলন। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ এক সময় পরিচালনা করেছেন। তিনি সমবায়ের মধ্যে সমবায় গঠন করে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করলেন। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সূচনা করলেন। গ্রামীণ কৃষি সমবায়ের সর্বজনীন সদস্যপদের ধারণা তাঁরই সৃষ্টি।

১৯৮৯ : ডাক পড়ল পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার। কলকাতায় গিয়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হলেন। কাজের পরিধি বেড়ে গেল। রাজ্য জুড়ে সমবায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে জেলায় জেলায় ছুটে যেতেন। বিভিন্ন জেলাকে যেমন পরামর্শ দিতেন তেমনি বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে রাজ্যে তা কাজে লাগাতেন।

এই সময় নতুন চিঠির সম্পাদক হয়েছেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। অশোক ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে নানা পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৯৭ : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত হন। পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। পুরস্কারের অর্থের ৫০ হাজার টাকা তিনি সমবায় আন্দোলনের বিকাশে দান করেন।

তিনি পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। সমবায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে ভারত সরকারের সংস্থা 'ইফকো' তাঁকে 'সমবায় রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে এশিয়ার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সচিব পদ

লাভ করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের আর্থিক সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে যখন 'বৈদ্যনাথন কমিশন' গঠন করে, তিনি সেই কমিশনের সদস্য হন এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বভারতীয় স্তরে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক যে সমবায় আইন সংস্কার হয়েছিল (২০০৬ সালে) তাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

১৯৯৯ সালের ১৮ মার্চ তিনি এবং নতুন চিঠির সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য বাংলাদেশ যান ড. মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। তিনি বাংলাদেশে সে সময় সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কীভাবে তা জানার জন্য। সেখানে যে সাক্ষাৎকার নেন সেটি পরবর্তী সময়ে নতুন চিঠি 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' নাম দিয়ে প্রকাশ করে। ২০০২ সালে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'স্বয়ম্ভরতা ও সমবায় পেশাদারিত্ব'। ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'স্বনির্ভরতার সন্ধানে' গ্রন্থটি।

সমবায়ের মধ্যে সমবায় হিসেবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়ে সারা দেশে এবং বিদেশেও ছুটে গেছেন। তিনি নাবার্ডের প্রতিনিধি হয়ে চীন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নরওয়ে গেছেন।

২০০৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের একমাত্র কন্যা তোতা (অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়)-র মৃত্যু হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রথমে ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর ভাই, ভাইপো এবং কমল গায়েন-এর মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছেন। আবার সহমর্মিতা ও সকলের সহযোগিতার ফলে সকলের সঙ্গে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।

২০১১ : পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। সমবায়গুলি দুর্নীতিতে ভরে ওঠে। তখন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের পরামর্শ নিয়ে তিনি 'সমবায় বাঁচাও আন্দোলন' গড়ে তোলেন। তিনি আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

বর্ধমান জেলা কৃষকসভা যখন সমবায় বিকাশের স্বার্থে 'সংকল্প পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' গঠন করে, সেখানেও অশোক ব্যানার্জী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সালানপুরে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিয়ে নাবার্ডের সহযোগিতায় জল বিভাজিকা প্রকল্প গড়ে তোলেন। সদরের সাধনপুরে বায়োটেক ভবন নির্মাণ। সেখানে 'নাট্রোফক্স' নামে জীবাণু সার তৈরি, কাঁকসার রঘুনাথপুরে 'রুরাল টেকনোলজি প্রকল্প' তৈরি, শ্রীধরপুর সমবায়কে কেন্দ্র করে সর্বাত্মক গ্রামউন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

২০১৬ : কলকাতা বইমেলায় ফেডারেশন অব ওয়েস্টবেঙ্গল আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেডের প্রকাশনায় 'সমবায়

ও সভ্যতা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচি বইটির উদ্বোধন করেন। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য অনেকে অনুরোধ করেন, তিনি কাজ শুরুও করেছিলেন— শেষ করা হল না।

বয়সের কারণে সমবায়ের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও তাঁর প্রিয় পত্রিকা 'নতুন চিঠি'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন। নতুন চিঠির সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে শুরু করেন। তিনি নতুন চিঠি ট্রাস্টের সভাপতিও ছিলেন।

মাঝে-মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সুস্থ হলেই ছুটে আসতেন নতুন চিঠি দপ্তরে। ছিলেন ভ্রমণপিপাসু। অসুস্থ শরীর নিয়েও ঝোলা কাঁধে চিরাচরিত ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়তেন।

২০২০ : ২৯ মার্চ বর্ধমান শহরের 'ডিপ্লোম্যাট' নার্সিংহোমে গৌরী ব্যানার্জীর হাতের শেষ ছোঁয়া কপালে পাওয়ার পরই সকাল ১০.৪৭ মিনিটে প্রয়াত হলেন ৮৩ বছর বয়সে। কোভিড-১৯ এবং লকডাউনের জন্য মানুষ জেনে গেলেও শেষযাত্রায় হাজির থাকতে পারেননি।

তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর লাল পতাকা ঢাকা মরদেহ তুলে দেওয়া হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে মানব কল্যাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য।

তাঁকে নিয়ে লেখালেখি, স্মরণ শুধুমাত্র স্মরণের জন্য নয়, তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার জন্যই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে ঘষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে..." কমিউনিস্টদের সংসারে তিনি ছিলেন সেই খাঁটি সোনা। প্রকৃত কমিউনিস্ট।

তথ্য সংগ্রহ : *নতুন চিঠি, তাঁর আত্মকথা, সেই সময় জেলে থাকা কয়েকজন সঙ্গীর সাক্ষাৎকার, দিলীপ দুবে-র 'এক নিরপরাধের আত্মকথন' গ্রন্থ থেকে।*

লেখক : *সাংবাদিক ও নতুন চিঠি পরিবারের সদস্য।*